লু শুন ও তাঁর রচনার ঐতিহাসিক পটভূমি

লু শুনের আসল নাম চৌ শু-রেন্। তাঁর জন্ম হয়েছিল চেকিয়াঙ প্রদেশের শাওসিঙ-এ, ১৮৮১ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর। তাঁর ঠাকুর্দা পিকিঙয়ে সরকারী কাজে নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু লু শুনের জন্মের অব্যবহিত পরে তিনি গ্রেপ্তার হন। তাঁর পিতাও অচিরে পক্ষাঘাতে শয্যা নেন। পারিবারিক এই দুর্যোগে তাঁর মা-র ওপরই সংসারের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। লু শুনের মা ছিলেন কর্মঠ এবং তাঁর উদারতা ও তেজোদ্দীপ্ততা চিরকাল লু শুনকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

ছেলেবেলা থেকেই তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে আত্মীয় বন্ধুমহল বিস্মিত হয়েছে। ছ' বছর বয়সে তিনি প্রথম স্কুলে যান এবং তখন থেকেই 'ক্ল্যাসিক' পড়তে শুরু করেন।' পরবর্তী বারো বছরে বহু চীনা ক্লাসিক্স তিনি পড়ে ফেলেন। তাঁর যে শুধু অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল তাই নয়, এসব গ্রন্থের নব ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করবার মত শক্তিও ছিল। এর জন্য সামন্ততান্ত্রিক ও পুরুষ-শাসিত তদানীন্তন চীনা সমাজব্যবস্থার নৈতিকতাকে পর্যন্ত প্রয়োজন মত আঘাত করতে তিনি দ্বিধা করেননি।

তরুণ লু শুন ফোক্ আর্টের মধ্যেও প্রভূত আনন্দ পেতেন। উদাহরণ স্বরূপ নববর্ষের ছবি, প্রচলিত গল্প-গাথা, ধর্মীয় শোভাযাত্রা ও গ্রাম্য অপেরার কথা বলা যেতে পারে। ২

গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে পরিচিতি ও বন্ধুবান্ধবদের অধিকাংশই সাদাসিধে কৃষক-সন্তান—তাঁর বাল্যকালের এটি একটি তাৎপর্যময় ঘটনা, যা তাঁর চরিত্র ও রচনার ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে পরবর্তীকালে।

অবশ্য লু শুনকে আসলে বিপ্লবের পথে নামিয়েছে বৈদেশিক শত্রুদের দেশের উপর হানা এবং চীনা সামন্ততন্ত্রের দেউলে অবস্থা।

লু শুনের বাল্যাবস্থা কেটেছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের ক্রমবর্ধমান আক্রমণের কালে। চিঙ রাজত্বের তখন ক্ষয়িষ্ণু, ক্রম-বীর্যহীন অবস্থা। রাজত্বকাল বৃদ্ধির মিথ্যা চেষ্টায় তারা বিদেশী শক্তিদের হাতে দেশের কিছু কিছু অংশ ছেড়ে দিয়ে, সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করেও তাদের সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিল, আর সেইসঙ্গে দেশবাসীর

স্বদেশপ্রেম-উদ্বুদ্ধ প্রতিরোধকে করতে চেয়েছিল দমন। ফলে আধা-উপনিবেশে পরিণত হয়ে চীন তখন সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে বিভক্ত হতে বসেছিল।

শাওসিয়াঙ যদিও অপেক্ষাকৃত ভাবে বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল তবু লু শুনের পারিবারিক দুর্যোগ আর তার সঙ্গে বিদেশী আক্রমণের হুমকির এই আকস্মিক যোগাযোগ ও সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দ্রুত অবনতি অনুভূতিশীল কিশোরটিকে শুধু যে তাঁর চার পাশের মানুষদের ভাগ্য সম্বন্ধেই ভাবিয়ে তুলল তা নয়, নিজের দেশের সম্বন্ধেও চিন্তার বিষয় জোগাল। পিতার অসুস্থতার দরুণ তের থেকে সতের বছর বয়সের মধ্যেই লু শুনকে বহুবার বন্ধকী কারবারের দোকানে ও ডাক্তারখানায় যাতায়াত করতে হয়। এখানে যে নিষ্ঠুর আবহাওয়া তিনি লক্ষ্য করেছিলেন তা গভীর রেখাপাত করেছিল তাঁর মনে। তদানীন্তন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অত্যাচারী প্রকৃতি ও তার মধ্যকার ত্রুটি ও দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে এবার তিনি সজাগ হতে শুরু করেন। তাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করতে শেখেন। তিনি আর বাপ-ঠাকুর্দার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বা আদালতের কেরানী কি ব্যবসায়ী হতে চাইলেন না।

১৮ বছর বয়সে মায়ের বহু কষ্টে সংগৃহীত রেলভাড়ায় আটটি ডলার সম্বল করে তিনি নানকিং-এ আসেন। প্রথম বছর বৃত্তি লাভ করে ক্সাভাল একাডেমীতে পড়ার পর কিয়াঙনান সামরিক প্রশিক্ষণালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত স্কুল অফ্ রেলওয়েজ অ্যাণ্ড মাইন্‌সে চলে আসেন। এখানেও তিনি পুরো সন্তুষ্টি পাননি তবে বুর্জোয়া চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর পরিচিতি ঘটে, বেশ কিছু আধুনিক বিদেশী সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক রচনার অনুবাদ পড়েন।

লু শুন চার বছর নানকিং-এ কাটান। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা স্থান লাভ করে। যেমন, ১৮৯৯ এর সংস্কার আন্দোলন (যা একটা সংবিধান-নির্ভর রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিল); সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বক্সার অভ্যুত্থান, আর তার অব্যবহিত পরেই ১৯০০ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের সম্মিলিত সেনাবাহিনীর পিকিং দখল। তাছাড়া ১৯০১ সালের 'বক্সার প্রোটোকল'-এর অপমান, যা আক্রমণকারীরা জোর করে চীনের ওপর আরোপ করেছিল—এই সব ঘটনা লু শুনের বিশ্বাস দৃঢ় করে তোলে যে সারা দেশকে সাম্রাজ্যবাদ ও চিঙ রাজত্বের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

১৯০১ সালে তিনি স্কুল অফ রেলওয়েজ অ্যাণ্ড মাইন্‌স্ থেকে ডিগ্রী লাভ করেন আর পরের বছর সরকারী বৃত্তি পান জাপানে পড়তে যাবার জন্য।

জাপানে পৌঁছবার পর তাঁর দেশভক্তি আরো উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। সেখানকার চীনা ছাত্রদের মাঞ্চু বিরোধী আন্দোলন তখন প্রবলতম এবং জাপান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত হবার জন্য রণপ্রস্তুতি চালাচ্ছে। দেশের জন্য কাজ করবার প্রবল ইচ্ছা তাঁর তখন থেকেই। এখানেই তিনি অবসর সময়ে প্রথম বায়রন, শেলী, হাইনে, পুশকিন; লারমন্টোভ, মিকিউইক্স ও পেটোফি প্রভৃতির রচনা পড়লেন—জাপানী বা জার্মান অনুবাদের মাধ্যমে। ইউরোপীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের সঙ্গেও পরিচিতি ঘটল।

সেণ্ডাই-এর মেডিকাল কলেজে তিনি এই বিশ্বাস নিয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন যে চীনের বিপ্লবের কাজে চিকিৎসা শাস্ত্র খুব কাজে লাগবে। এর দু' বছর পরে তিনি রুশ-জাপানী যুদ্ধের একটা নিউজ রিল দেখেন। এতে নির্যাতিত চীনা দেশবাসীদের অনুভূতিহীন শোচনীয় কতকগুলো মুখাবয়ব প্রদর্শিত হয়েছিল। সিনেমাটা দেখবার পর লু শুন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন এবং মন পরিবর্তন করেন।

তিনি লিখছেন, "এরপর আমার মনে হয়েছিল যে, চিকিৎসা শাস্ত্র আসলে ততটা প্রয়োজনীয় নয়। একটা দুর্বল ও পশ্চাদবর্তী দেশের জনসাধারণ যতই সবল ও স্বাস্থ্যবান হ'ক না কেন তারা শুধু অন্যের সামনে উদাহরণ স্বরূপ এসে দাঁড়ানো ছাড়া বা পূর্বোক্তরূপ করুণ দৃশ্যের নায়ক হওয়া ভিন্ন কিছু করতে পারবে না।...সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ এদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানো। আর আমি সে সময় যেহেতু ভেবেছিলাম যে সাহিত্যই এই উদ্দেশ্য সাধনে যোগ্যতম তাই স্থির করেছিলাম একটা সাহিত্য আন্দোলনের প্রবর্তন করব।"

এ ঘটনা ১৯০৬ সালের।

১৯০৮ সালে তিনি মাঞ্চু-বিরোধী বিপ্লবী পার্টি, কুয়াং ফু হুই-এ যোগ দেন।

এইভাবে জাপানে আট বছর অতিবাহিত করার সময়ই তিনি একজন দৃঢ়বিশ্বাসী বিপ্লবী গণতন্ত্রীতে পরিণত হন এবং নিজ দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার কাজে সাহিত্যের সাহায্য নেবার নিজ সিদ্ধান্তে অবিচল হয়ে ওঠেন।

১৯০৯ সালে তিনি চীনে ফিরে আসেন।

১৯১১-র বিপ্লবকে লু শুন প্রাণের সমর্থন জানান। তিনি তখন চেকিয়াঙ নর্মাল স্কুলে ফিজিওলজি ও রসায়ন বিদ্যা পড়াতেন। নিজের ছাত্রদের বিপ্লবের হয়ে কাজ করবার জন্য তিনি অনুপ্রেরণা দেন। ১৯১২ সালে তিনি স্কুলটির অধ্যক্ষের পদে নির্বাচিত হন। এই বছরই চীনা রিপাবলিকের প্রভিশনাল

গভর্নমেন্টের পত্তন হয় ও তিনি শিক্ষা বিভাগের একজন সদস্যরূপে নিয়োজিত হ'ন। অতি শীঘ্রই অবশ্য তাঁর মোহভঙ্গ হয় ও এই পদে তিনি ইস্তফা দেন।

১৯১১-র বিপ্লবের গভীর তাৎপর্য থাকা সত্ত্বেও এটি তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করতে পারেনি। চিঙ রাজত্বের মূলোচ্ছেদ হ'ল কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রকে একটুও টলান গেল না। রাষ্ট্রক্ষমতা সামন্তপ্রভু ও যুদ্ধবাজ বিভিন্ন গোষ্ঠীর রাজনীতিবিদদের করায়ত্ত হ'ল, আর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা তাদের ব্যবহার করতে শুরু করল চীনের ওপর নিজেদের আগ্রাসনীতি আরো জোরদার করার কাজে। এইভাবে সামন্তপ্রভুদের স্ব স্ব সরকার স্থাপন, একটানা গৃহযুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের নিজ নিজ প্রভাবের সীমা বাড়ানো নিয়ে খেয়োখেয়ির মাঝে পড়ে চীনের আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ঔপনিবেশিক চরিত্র আরো প্রকট হয়ে ওঠে। তা ছাড়া 'দাও ফিরে সে অরণ্য' গোছের এক প্রকার পুরানো দিনে প্রত্যাবর্তনের প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারাও প্রভাব বিস্তার করে।

১৯১৯ সালের ৪ঠা মে-র প্রখ্যাত আন্দোলন অবধি লু শুন দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তেই কাটান। ইতিমধ্যে তিনি অবশ্য চীনা সংস্কৃতি বিষয়ক মূল্যবান অনেক কাজই সমাধা করেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ায় চীনের ওপর ইউরোপীয় ও মার্কিনী শক্তিদের মুঠো একটু আলগা হয় এবং তার ফলে চীনের জাতীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কিছু পরিমাণে বিকাশ লাভের সুযোগ পায়। ১৯১৭-র অক্টোবর বিপ্লব চীনে এক নব বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সূচনা করে যা পরবর্তী কালে পুরোপুরি ভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামে পরিণত হয়। ১৯১৯-এর ৪ঠা মে আন্দোলন তারই চরম পরিণতি।

১৯১৮-য় লু শুন এই ছদ্মনামের অন্তরালে তাঁর প্রথম গল্প 'পাগলের দিনলিপি' 'নব যৌবন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সময় থেকেই সামাজিক সমস্যাকে নিয়ে কশাঘাত করে তাঁর অন্তস্পর্শী নিবন্ধ রচনার শুরু। ১৯২৩-শে 'কল টু আর্মস' নামক তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ প্রকাশ তাঁকে চীনের নতুন সাহিত্য স্রষ্টাদের পুরোধায় স্থাপিত করল।

লু শুন এরপর থেকে সারা সময়টাই তরুণদের সংস্পর্শে কাটান। ১৯২০ সাল থেকে তিনি পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাছাড়া তিনি একটি দৈনিকের সংযোজনী অংশ সম্পাদিত করেছেন, আর

তরুণ লেখকদের বেশ কয়েকটি সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছেন। তরুণ লেখকদের পাণ্ডুলিপি তিনি ভারী সযত্নে সংশোধন করতেন। ১৯২৪ সালে শিক্ষামন্ত্রী Peking Women Normal College অন্যায়ভাবে বন্ধ করে দিলে ছাত্রীরা যখন তার প্রতিবাদ করে, তিনিও (এই কলেজের লেকচারার পদে তখন অধিষ্ঠিত ছিলেন) তাঁদের সমর্থন করেছিলেন। ১৯২৬ সালের ১৮-ই মার্চ উত্তরাঞ্চলের সামন্তপ্রভু তুয়ান চি-যুই ছাত্রদের ওপর বর্বর আক্রমণ চালালে অনেকে হতাহত হন। লু শুন তখন ছাত্রদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন—এগিয়ে আসেন তাদের পক্ষ নিয়ে। বহু প্রবন্ধ লেখা ছাড়াও ব্যবহারিক ভাবেও প্রভূত সাহায্য করেন। ফলে ১৯২৪ থেকে ১৯২৬-এর মধ্যে পিকিঙের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কয়েক জনের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

দেশ জুড়ে যখন ১৯২৬ সালে বিপ্লবের দারুণ জোয়ার বইছিল প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তপ্রভু পরিচালিত সরকারের চাপে পড়ে তিনি পিকিঙ ছাড়তে বাধ্য হন। ১৯১৮ থেকে ১৯২৬, এই ন' বছর তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম বহুকর্মপ্রসূ অধ্যায়। পিকিঙ ত্যাগ করার পূর্বে তাঁর ছোট গল্পগুলি ছাড়াও সংগৃহীত প্রবন্ধের চারটি বই, গদ্য-কবিতার সঙ্কলন 'বুনো ঘাস' এবং 'চীনা গল্প সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া অনূদিত রচনার পরিমাণ তো তাঁর নিজস্ব রচনার চেয়ে অনেক বেশী ছিল। পাঠকদের কাছে তিনি এই অনুবাদের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহিত্য তত্ত্ব ও ব্লকের 'বারো' নামক কবিতাটি উপস্থাপিত করেন।

লু শুন ১৯২৬ সালে আময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য বিভাগের প্রফেসারের পদ গ্রহণ করেন। তারপর ১৯২৭-এর জানুয়ারীতে ক্যান্টন যান, সান ইয়াৎ-সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধারে 'ডিন্' ও চীনা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান হিসাবে। এই বছরের এপ্রিল মাসে চিয়াং কাই-সেক বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'রে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার ও হত্যা করে। সান ইয়াৎ-সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রকেও ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়। তীব্র প্রতিবাদ স্বরূপ লু শুন কাজে ইস্তফা দেন এবং জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠায় শাংহাই চলে আসতে বাধ্য হন। এরপর আমৃত্যুকাল তিনি এখানেই কাটান, আর শিক্ষকতা ছেড়ে পুরো উদ্যম নিয়োজিত করেন সাহিত্য ও সাহিত্য আন্দোলনের পিছনে।

১৯২৭ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত চীনে দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ চলে ছিল।

কুয়োমিনটাঙ তখন বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে মাথা নত করে সারা দেশে অত্যাচারের রাজ কায়েম করেছে। শুধু বন্দুকের হুমকিই নয়, সাংস্কৃতিক ভাবেও বিপ্লবের শত্রুতা করেছে। ১৯৩১ শে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা দেশের উত্তর-পূর্বে বিশাল অংশ অধিকার করে নিল। ১৯৩২ শে তারা আক্রমণ করল শাংহাই। ১৯৩৪ থেকে ৩৬-এর মধ্যে জাপানী আক্রমণ পিকিঙ ও টিয়েনষ্টিন অবধি এসে পৌঁছয়। ১৯৩৪-এর ১৭ই এপ্রিল জাপানী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি খোলাখুলি ভাবে ঘোষণা করে যে চীন এখন তাদের পদানত। ১৯৩৫ শে হো-উমেজু চুক্তি স্বাক্ষরিত করে কুয়োমিনটাঙ হোপেই ও চাহার প্রদেশের সার্বভৌমত্ব বৈদেশিক শক্তির হাতে সমর্পণ করে। ১৯৩৬ সালে জাপানী শক্তি অন্তর্মঙ্গোলিয়া অধিকার করে নিয়ে একটি তথাকথিত "স্বায়ত্তশাসিত সরকার" পত্তন করে।

এই সময় সমগ্র দেশ সোচ্চার হয়ে ওঠে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করার আহ্বানে, যাতে সারা দেশ একত্রিত হয়ে আক্রমণকারীদের প্রতিহত করতে পারে। কিন্তু মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও সামন্ত প্রভুদের স্বার্থরক্ষাই ছিল কুয়োমিনটাঙের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাই সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় তারা সমস্ত প্রতি-বিপ্লবী শক্তি একত্রিত করে শুরু করল কমিউনিস্ট উচ্ছেদের কাজ, আর সাথে সাথে শত্রুর কাছে নতি স্বীকার করে সব জাপানী দাবি-দাওয়া মেনে নিতে থাকল। ফলত এই সরকার ক্রমশ গণ সমর্থন হারাতে থাকে এবং মরিয়া হয়ে নির্যাতনের আশ্রয় নেয়—বাক্‌স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করে, বইয়ের দোকান ভাঙতে থাকে, দেশপ্রেমিক ও প্রগতিবাদীদের হত্যা করে চলে।

শ্বেত সন্ত্রাসের এই নগ্নরূপের সঙ্গে পরিচিতি ঘটিয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি। জাতীয় স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে নিজেদের এই প্রতারণা ঢাকতে ও জনসাধারণকে ধাপ্পা দিতে এরা বিবিধ "তত্ত্ব"-র আশ্রয় নিয়েছে। "পাশ্চাত্য ঘেঁষা ভদ্রলোক" ও "পণ্ডিত"রা একযোগে আক্রমণ চালিয়েছে প্রগতিবাদী লেখকদের ওপর। তাদের কেউ কেউ গুজব ছড়াত, কেউ করত গুপ্তচরের কাজ। বহুবিধ মুখোশ ও ছদ্মবেশের তারা আশ্রয় নিয়েছিল। এরা সাহিত্যের শ্রেণীচরিত্র অস্বীকার করে "শিল্পের জন্যই শিল্প"-তত্ত্ব প্রচার করেছিল তরুণ সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করার জন্য। ভেবেছিল এইভাবে হয়ত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিকটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা অসম্ভব করে তোলা যাবে।

কুয়োমিনটাঙের এইসব প্রতারণা ও আপাতভাবে সম্ভ্রম উদ্রেককারী

"অধ্যাপক" ও "পণ্ডিত" প্রবরদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করাই বোঝা যাচ্ছে সে সময়কার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলোর সর্বাপেক্ষা জরুরী কাজে পর্যবসিত হয়েছিল। এই পটভূমিকার উপরেই লু শুনের তৎকালীন প্রবন্ধগুলো রচিত।

১৯২৮ সালে লু শুন 'দা টরেন্ট' পত্রিকার পত্তন করেন এবং মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ সম্বন্ধে পড়াশোনা ও মার্ক্সীয় সাহিত্যতত্ত্ব অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন। একই সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়ে ওঠে আরো নিবিড়। ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে শাংহাইয়ে 'বামপন্থী চীনা সাহিত্যিক সংঘে'-র পত্তন হয়। বিপ্লবী সাহিত্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। লু শুন এই সংঘের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন। ১৯৩৩-এর জানুয়ারীতে তিনি 'চাইনীজ লীগ ফর সিভিল রাইট্‌স্'-এ যোগ দেন এবং মে মাসে শাংহাইয়ের জার্মান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করে নাজি বর্বরতার কঠোর সমালোচনা করে লেখা একটি প্রতিবাদপত্র তাঁর হাতে তুলে দেন। শাংহাইয়ের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী আন্তর্জাতিক আলোচনা সভার আয়োজনের কাজে তিনি প্রভূত সাহায্য করেন। শ্বেত সন্ত্রাসের কারণে তখন অতীব গোপনীয়তা রক্ষা করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।

জীবনের শেষ দশ বছরে লু শুন দশটি প্রবন্ধ-গ্রন্থ রচনা করেন। তাছাড়া ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর ওপর লেখা একটি ছোট গল্পের বই ও অসংখ্য অনুবাদও প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য অনুবাদের মধ্যে কয়েকটির নাম দেওয়া হ'ল: প্লেখানভের 'দা থিওরি অফ আর্ট', লুনাচার্স্কির 'লিটারেচার অ্যাণ্ড ক্রিটিসিজম,' ফাদায়েভের উপন্যাস 'উনিশ', ইয়াকোভ্‌লবের 'অক্টোবর,' ফুরমানব ও অন্যদের লেখা দু'টি ছোট গল্পের বই, গোর্কির 'রুশ রূপকথা' এবং গোগলের 'মৃত আত্মা'। তা ছাড়া সেরাফিমোভিচের 'আয়রণ স্ট্রীম', গ্ল্যাডকভের 'সিমেন্ট', শোলোকভের 'ধীর প্রবাহিনী ডন্' এবং ইভানভের 'আরমার্ড ট্রেন'—এই গ্রন্থগুলির সাথেও তিনি স্বদেশবাসীর পরিচয় করিয়ে দেন।

লু শুন এই দশ বছরের মধ্যেই সোভিয়েত উড্‌কাট ও জার্মান শিল্পী কেথে কোলউইৎজ্-এর উডকাট দেশবাসীর সম্মুখে প্রদর্শন করেন, আর সাথে সাথে চীনের নতুন বিপ্লবী উড্‌কাট শিল্পকে উৎসাহ যোগান, পথ প্রদর্শন করেন।

এই সময় তাঁর কাজের সময়ের এক তৃতীয়াংশ কাটত তরুণ লেখকদের লেখা পড়ে, তাদের চিঠির উত্তর দিয়ে ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সম্পাদকের কর্তব্য পালন করে। মৃত্যুর আগে ১৯৩৬ সালে যখন তিনি শেষবারের মত অসুস্থ হয়ে

পড়লেন (বহুদিন যাবৎ যক্ষ্মায় ভুগছিলেন), তখনো তিনি কুয়োমিনটাঙের হাতে নিহত চিউ-পাই নামক একজন প্রখ্যাত চীনা কমিউনিস্টের লেখা ও অনুবাদ প্রকাশের কাজে ও তরুণ লেখকদের রচনা-পাঠ ও মুখবন্ধ লিখে দেওয়া নিয়ে সদা ব্যস্ত ছিলেন।

বিপ্লবী নিধনের আয়োজন করে কুয়োমিনটাঙ যে শ্বেত সন্ত্রাস চালিয়েছিল তার ফলে লু শুন কতিপয় তরুণ ও দু'এক জন কমিউনিস্টের সঙ্গে কেবল সংযোগ বজায় রাখতে পেরেছিলেন—তাও অতি গোপনে। যে কোন দিন, যে কোন মুহূর্তে আটক হবার ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবার আশঙ্কার মধ্যে বাস করেও তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন, অবিচল নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন প্রগতিশীল সাহিত্যিক ও শিল্পীদের। কুয়োমিণ্টাঙের সেই কুখ্যাত দশবর্ষব্যাপী কার্যসূচী, যা বিপ্লবী লেখকদের নীরব করে দেবার সংকল্প নিয়েছিল তা তাঁর সাংস্কৃতিক কার্যসূচী অব্যাহত ভাবে চালিয়ে যাবার ফলে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়।

লু শুনের শেষ ক'টি প্রবন্ধের মধ্যে অন্যতম ৩রা জুন, ১৯৩৬ সালে লেখা 'একজন ট্রটস্কি-পন্থীর চিঠির জবাব'। ট্রটস্কি-পন্থীরা চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কুৎসা করে, লু শুনকেও পেতে চেয়েছিল নিজেদের দলে। লু শুন লিখেছিলেন, "আপনাদের "তত্ত্ব" মাও সে-তুঙের চাইতে নিশ্চয় অনেক উচ্চমার্গের : আপনাদেরটা আকাশচারী আর মাও সে-তুঙের চিন্তাধারা মৃত্তিকাস্পর্শী।"

লু শুন বহুদিন যাবৎ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন কিন্তু শেষ দিন পর্যন্ত মুহূর্তের জন্য তিনি বিশ্রামের কথা ভাবেন নি। ১৯শে অক্টোবর, ১৯৩৬ সালে শাংহাইয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

স্বার্থত্যাগ বিষয়ক

"এই যে, শুনুন! শুনুন! যাক্, আমরা দেখছি দু'ই কমরেড। প্রথমে তো তোমাকে ভিখিরি বলেই মনে করেছিলাম, আর ভাবছিলাম: 'এমন সুন্দর ছেলে—বয়স হয়নি, পঙ্গুও নয়, তবে কেন কাজ করে না, পড়াশোনা করে না?' আর তাই না 'একজন গুণী ব্যক্তির সম্বন্ধেও খারাপ ভেবে' বসেছিলাম। কিছু মনে কোরো না যেন। ব্যাপার হচ্ছে আমরা এত স্পষ্টভাষী যে কিছুই গোপন করি না। হাঃ হাঃ। সে যাই হোক কমরেড, তোমাকে যেন মনে হচ্ছে একটু বেশি .....।

"ওহো! সর্বস্ব পরিত্যাগ করেছো তাহলে? প্রশংসনীয়! প্রশংসনীয়! স্বদেশবাসীর জন্যে বা দেশের জন্যে যারা সর্বস্ব ত্যাগ করে তারা আমার সর্বাধিক প্রশংসার পাত্র। ঠিক যেটি আমি নিজে করতে চেয়েছি চিরকাল! আমার বাহারী পোশাক-আশাক দেখে ভুল বুঝো না: এধার সেধার ঘুরে ঘুরে আমায় প্রচারকার্য চালাতে হয় কিনা, তাই এই ভাবে ড্রেস করতে হয়। মানুষ এখনো বড় উন্নাসিক, তোমার মতো ঐ রকম ছেঁড়াখোঁড়া পাতলুন পরি যদি কে শুনবে আমার কথা? কাজেই এই নিয়ে ফিসফাস হলেও উপায় নেই, বাহারী পোশাক আমায় পরতেই হবে। আমার অবশ্য লজ্জিত বোধ করার কোন কারণ নেই। 'ইউ উলঙ্গ হয়েই উলঙ্গদের দেশে গেছলো।'* সমাজসংস্কার করতে গেলে এটুকু মেনে না নিয়ে উপায় নেই। এর জন্য যে আমায় কত খরচ বহন করতে হয় তা অবশ্য লোকে জানতেই পারে না। কিন্তু বন্ধু, তোমায় এত নির্জীব দেখাচ্ছে, এ কি রকম ব্যাপার?

"ওহো! ন' দিন তাহলে খাওয়া হয়নি? কি মহান! প্রশংসায় অভিভূত হয়ে পড়েছি। তুমি হয়তো আর বেশি দিন টিকবে না, কিন্তু এ আমি হলফ করে বলতে পারি, ইতিহাসে তোমার নাম অমর হয়ে থাকবে। অভিনন্দন

---

* ইউ পৌরাণিক কালের একজন খ্যাতনামা শাসক। উক্তিটি 'যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ' ধরনের।

জানাই তোমায়! পশ্চিমী রীতিনীতি প্রবর্তন সম্বন্ধে আজকাল যে সমস্ত পাপ কথাবার্তা চলেছে তারই সাথে সাথে লোকের নজর পড়তে শুরু করেছে ব্যবহারিক দ্রব্যের ওপর। জানো, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসাররা পর্যন্ত এখন তারা যে পড়াচ্ছে সেই জন্যে টাকা চাইছে! বস্তুগত লাভ ছাড়া ওরা আর কিছু কেয়ার করে না— বস্তুবাদ বিষিয়ে দিয়েছে ওদের। নিজের কাজের মধ্যে দিয়ে তুমি তাই যে সুন্দর আদর্শ স্থাপন করছ, জনগণের নৈতিক চরিত্রের ওপর তার দারুণ এক হিতকর প্রভাব পড়বেই। যে সর্বজনীন্ শিক্ষা প্রবর্তনের দাবীতে সবাই এখন সোচ্চার, সে কথাটাই একবার ভেবে দেখ। ভেবে দেখ এটি যদি প্রবর্তিত হয় তাহলে কত শত শিক্ষকের প্রয়োজন পড়বে। আর তারা যদি এই প্রফেসারদের মত খেতে চায়, তখন? যা দুর্দিন, অত খাদ্যবস্তু আসবে কোত্থেকে? এই শঠ পৃথিবীটাতে তোমার মত মহৎ চরিত্রের জুড়ি মেলে না—'মাঝনদীতে এক নিঃসঙ্গ শিলা'র মতো।' প্রশংসনীয়! প্রশংসনীয়! লেখাপড়া কিছু করেছো? যদি করে থাকো তো বলো আমি তোমায় একটা কলেজের অধ্যক্ষ হবার জন্য আমন্ত্রণ জানাবো। শীঘ্রই খুলবো কলেজটা। 'চারখানা পুঁথি'* যদি পড়া থাকে তাহলেই কাজ চলে যাবে। এত গুণ তোমার—ছাত্রদের সামনে চমৎকার এক উদাহরণ খাড়া করতে পারবে।

"পারবে না? শরীর ভাল নেই? বড়ই দুঃখের কথা। বড়ই দুঃখের কথা। এতেই বোঝা যাচ্ছে, সমাজের জন্যে নিজেকে যে উৎসর্গ করে দিয়েছে তাকেও কিন্তু নিজের শরীরের যত্ন না নিলে চলবে না। বড়ই দুঃখের কথা যে এই ভাবে তুমি শরীরটাকে উপেক্ষা করেছো। এ কথা যেন ভেবে বসো না যে আমার হৃষ্ট-পুষ্টির কারণ সুখী জীবনযাপন। বস্তুত এ কেবল স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের অবদান, বিশেষ করে মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান। 'ভদ্রলোক মাত্রেই সত্যাসত্য নিয়ে চিন্তিত, দারিদ্র্য নিয়ে নয়।' কিন্তু তুমি যে কমরেড সব পরিত্যাগ করেছো এটাও খুব গৌরবজনক। বড়ই দুঃখের কথা এখনো তোমার এক খানা পাতলুন রয়েছে। এর জন্যে না আবার ইতিহাসে তোমার নামের পাশে একটা কলঙ্ক চিহ্ন থেকে যায়!

"ও হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। তোমায় আর বলে দিতে হবে না। জানা কথা

---

* চারখানা কনফুসীয় ক্লাসিক—'মহৎ শিক্ষা', 'মধ্যপন্থার নীতি,' 'অ্যানালেক্টস' ও 'মেন্‌সিউস'।

তুমি এই পাতলুনটাও চাও না—সব কাজই একেধারে নিখুঁত ভাবে সারতে চাও। খুব স্বাভাবিক। বুঝতে পারছি এখনো ওটা কাউকে দেবার সুযোগ পাওনি। নিজেও আমি চিরকাল সর্বস্ব ত্যাগে বিশ্বাসী এবং অন্যদেরও এবংবিধ সৎ কাজে সাহায্য করতেই ভালবাসি। তা ছাড়া তোমার আমার মধ্যে কমরেডের সম্পর্ক—আমার কর্তব্যই হ'ল তোমাকে একটা সন্তোষজনক পথ বাতলে দেওয়া। মানুষের জীবনের সমাপ্তি পর্বটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে। একবার একটা ভুল পদক্ষেপ করেছো কি, বৎস—সব হয়তো মাটি করে বসবে।

"ঠিক সময় মতো হয়েছে যা হোক—আমাদের বাড়ির একটি বাঁদী মেয়ের একখানা পাতলুনের দরকার ছিল...। অমন করে আমার দিকে তাকিও না বন্ধু, মানুষ কেনাবেচার আমি ঘোর বিরোধী, ব্যাপারটা এত অমানবিক না! কিন্তু সেবার দুর্ভিক্ষ হ'ল আর তারপর থেকেই মেয়েটা আমার কাছে গচ্ছিত রয়েছে। আমি যদি ওকে না নিতাম তো ওর বাপ-মাই ওকে পতিতালয়ে বেচে দিত। ভেবে দেখ সেটা কি দুঃখের ব্যাপারই না হ'ত! তাই শুধুমাত্র দয়াবশত ওকে রেখেছি। তাছাড়া একে তো আর কেনা বলে না—ওর বাপ-মাকে শুধু ক'টা ডলার দিয়েছিলাম এবং তারা ওকে আমার কাছে রেখে গেছলো। এই তো ব্যাপার। ইচ্ছে ছিল ওকে নিজের মেয়ের মতোই, না না, বোনের মতোই দেখবো। দেখবো নিজের রক্ত মাংসের একজন হিসেবেই। দুর্ভাগ্য, আমার পত্নী আবার এক সেকেলে মহিলা, এসব কথা শুনতে চান না। তুমি তো জানো, একজন সেকেলে মহিলা যদি জেদ ধরে তাহলে কি ঝামেলাটাই হয়। এখন তাই অন্য একটা উপায় বার করবার চেষ্টা করছি, যাতে...

"কিন্তু বহুদিন যাবৎ মেয়েটার একটাও পাতলুন নেই। আমি জানি উদ্বাস্তুদের এই মেয়েটিকে তুমি খুশি মনেই সাহায্য করবে। দু'জনেই আমরা গরীবের বন্ধু। তা ছাড়া এ কাজটা সেরে ফেলা মানেই একটা মহান জীবন তার চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করলো। আমি কথা দিচ্ছি তোমার নামে একটা চিত্তাকর্ষক ব্রোঞ্জের মূর্তি বানিয়ে দেবো, আকাশ ছোঁবে সেটা। আহ্, দরিদ্ররা শ্রদ্ধায় তার সামনে মাথা নত করবে...।

"এই তো—জানতাম তুমি রাজি হবে। তোমার আর মুখ ফুটে বলার দরকার নেই। যাই হোক পাতলুনটা এখানে যেন আবার খুলে ফেলো না। বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যে রকম বেশভূষা পরেছি তাতে করে এখন যদি ওই ছেঁড়াখোঁড়া পাতলুনটা বয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহলে লোকে ভুরু কুঁচকে

তাকাবে এবং আমাদের 'স্বার্থত্যাগ করো', অভিমান এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। একালের লোকগুলো এক একটা আস্ত নির্বোধ। ভাবো একবার, শিক্ষকরা অবধি খেতে চাইছে—কদর বুঝবে কি করে শুনি আমাদের উদ্দেশ্যর বিশুদ্ধতার? ঠিক ওরা ভুল বুঝে বসবে। আর তুমি বন্ধু তখন ভালো কিছু করতে তো পারবেই না, উল্টে মন্দ করে বসতে পারো।

"কয়েক পা হাঁটতে পারবে কোন রকমে? না? ঝামেলা বাধালে একটা! হামাগুড়ি দিতে পারবে? বেশ। তাহলে হামাগুড়ি দাও। শক্তি থাকতে থাকতেই হামাগুড়ি দিয়ে ওখানে পৌঁছতে চেষ্টা করো। মনে জোর রাখো, শেষ মুহূর্তে যেন ভরাডুবি না হয়। আর হামাগুড়ি দেবার সময় খেয়াল রাখবে যাতে হাঁটুর ওপর বেশি ভর না পড়ে, আঙুলে ভর রেখে এগোবে। নয়তো পাথরকুচি আর খোয়ায় লেগে পাতলুনটা ছিঁড়ে যাবে, আরো জীর্ণ হয়ে পড়বে। উদ্বাস্তুদের গরীব মেয়েটির তাহলে আর বিশেষ কোন লাভ হবে না, তোমার সব প্রয়াসও বৃথাই যাবে। এখনই পাতলুন খুলে ফেলাটা ভাল হবে না। প্রথমত দেখাবে খারাপ, দ্বিতীয়ত—পুলিশী হস্তক্ষেপের ভয় আছে। কাজেই পাতলুন পরেই হামাগুড়ি দাও। আমরা দু জনা তো আর অপরিচিত কেউ নই বন্ধু, কেন ঠকাবো তোমায় বলো? পুবদিকে গিয়ে উত্তরদিকে মোড় নেবে, তারপর দক্ষিণ দিকে। দেখবে রাস্তাটার উত্তর প্রান্তে একটা লালরঙা গেট আর দুটো শোফোরা গাছ আছে—এই হল তোমার গন্তব্যস্থল। ওখানে পৌঁছেই পাতলুনটা খুলে নেবে আর দ্বাররক্ষীকে বলবে তোমার মনিব এটা তোমার মাইজির কাছে দিয়ে আসতে বলেছেন। দ্বাররক্ষীর সাথে দেখা হওয়া মাত্র এটা বোলো কিন্তু, নয়তো ভিখিরি ভেবে প্রহার লাগাতে পারে। আহ, কিছুদিন যাবৎ ভিখিরির সংখ্যা এত বেড়েছে না—কাজও করবে না লেখাপড়াও করবে না, খালি ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে! আমার দ্বাররক্ষী তাই ওদের একটা উচিত শিক্ষা দিতে উত্তম মধ্যম লাগায়। তবেই না জানতে পারবে যে ভিখিরিদের মার খেতে হয়। তবেই না বুঝবে যে কাজ করা বা পড়াশোনা করাটাই সবচেয়ে ভাল......

"চললে তাহলে? ভাল, ভাল! কিন্তু কাজটা শেষ হবার পর হামাগুড়ি দিয়ে সরে পড়তে কালবিলম্ব কোরো না, বাড়ির চত্বরের মধ্যে থেক না। ন'দিন কিছু খাওনি, কিছু যদি ঘটে তো গাদা ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে। জনগণের হিতার্থে যে মূল্যবান সময়টা এমনিতে আমি উৎসর্গ করি তার বেশ খানিকটা খোয়াতে হবে তখন। আমরা দুজন তো আর অপরিচিত মানুষ নই, তাই আমি জানি

যে নিজের কমরেডকে তুমি ঝপ্পাটে ফেলতে চাইবে না। যাক্—এসব বাজে কথা এখন থাক।

"এগোতে শুরু করে দাও তাহলে! বেশ বেশ! তোমার জন্য একটা রিক্সা ডেকে দিতে পারতাম ঠিকই, কিন্তু জানি তো পশুর জায়গায় মানুষ মানুষকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এ তুমি সহ্য করতে পার না। সত্যিই, ব্যাপারটা একেবারেই অমানবিক। আমি এখন চললাম তাহলে। তোমার এবার গাত্রোত্থান করা উচিত। কিন্তু অমন ক্লান্ত আর দুর্বল দেখাচ্ছে কেন হে? হামাগুড়ি দাও বন্ধু! চট্‌পট্ কমরেড, হামাগুড়ি দাও পুব দিকে..."

যোদ্ধা ও মাছি*

শোপেন্‌হয়ের বলেছেন যে, মানুষের মহত্ব বিচার করতে গেলে দেখা যায়, তার নৈতিক মান ও দৈহিক আকার নিয়ন্ত্রণকারী সূত্রগুলো (laws) একে অন্যের বিপরীত। কারণ একজন মানুষ আমাদের কাছ থেকে যত দূরে সরে যায়, তার চেহারা তত ছোট এবং তেজোদ্দীপ্ততা তত বেশি অনুভূত হয়।

খুব কাছ থেকে দেখলে মানুষের যত খুঁত ও ক্ষত সব পরিষ্কার চোখে পড়ে। তাই তাকে আর তখন তেমন বীর বলে মনে হয় না, মনে হয় এতো আমাদেরই একজন—ভগবান নয়, অতিপ্রাকৃতিক কিছু নয়, নতুন প্রজাতির (species) বিচিত্র জীবও নয়। স্রেফ্ অতি সাধারণ একটি মানুষ। ঠিক এরই মধ্যে কিন্তু লুকিয়ে রয়েছে মানুষের মহত্ব।

যুদ্ধে একজন যোদ্ধা ভূতলশায়ী হলে প্রথম যে জিনিসটা মাছিদের চোখে পড়ে তা হল যোদ্ধার খুঁত ও ক্ষত। ভন্-ভন্ করতে করতে এরা তখন তাদের রক্ত চোষে, ভেবে খুব খুশি যে মৃত সৈনিকটির চেয়ে তারা আরো বড় দরের বীর। নিহত যোদ্ধা তাদের তাড়িয়ে দেয় না বলে মাছিগুলোর ভনভনানি আরো

* যোদ্ধা বলতে ডক্টর সান ইয়াৎ-সেন এবং ১৯১১র বিপ্লবের শহীদদের বোঝানো হচ্ছে। মাছি বলতে প্রতিক্রিয়াশীলদের ভাড়াটে কুত্তাদের।

উচ্চগ্রামে ওঠে। ওরা ভাবে কালজয়ী সঙ্গীত সৃষ্টি করছে, কারণ মৃত সৈনিকটির তুলনায় বলতে গেলে ওরা একেবারে নিখুঁত, অক্ষত।

ঠিক-ই তো, মাছিদের খুঁত বা ক্ষতের দিকে কেউই কোন নজর দেয় না।

তবু শত শত খুঁত থাকলেও যোদ্ধা যোদ্ধাই, আর সর্বাপেক্ষা নিখুঁত ও অক্ষত মাছি, শুধু মাছিই।

উড়ে যারে মাছি! তোদের ডানা থাকতে পারে, গুনগুন করতেও পারিস, কিন্তু সে যাইহোক তোরা কীট-পতঙ্গের দল কোনদিনই যোদ্ধাদের নখের যুগ্যি হতেও পারবি না!

গ্রীষ্মের আপদ

গ্রীষ্ম আসছে। এবার আমাদের তিন আপদের : পোকা, মশা, আর মাছির সম্মুখীন হতে হবে।

কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করতো যে, এই তিনটির মধ্যে বেছে নিতে হলে আমি কোনটিকে বেছে নেব, আর আমাকে যদি সেই 'তরুণদের অবশ্য পাঠ্য'* ব্যাপারটার মত একটা শাদা কাগজ হাতে করে বাড়িয়ে না দিয়ে সত্যিই এদের মধ্যে থেকে কোনো একটার নাম করতে হত, তাহলে বলতাম : পোকা।

যদিও পোকারা যখন আপনার রক্ত শুষে খায় তখন তা বড়ই অপ্রীতিকর লাগে তবু টুঁ শব্দটি না করেই তাদের দল ফোটানোর রকমটা অত্যন্ত সোজাসুজি ও স্পষ্ট। মশাদের ব্যাপার কিন্তু একেবারেই অন্যরকম। তাদের চামড়া ভেদ করার প্রক্রিয়াটাকে মোটামুটি ভাবে নিখুঁত বলে ধরা চলে। কিন্তু কামড় দেবার

* প্রতিটি ছাত্রেরই পড়া উচিত এই ধরনের দশটি বইয়ের নাম উল্লেখ করতে বলে 'পিকিং নিউজ সাপ্লিমেন্টের' তরফ থেকে লু শুনকে অনুরোধ করা হয়েছিল। লু শুন তার পরিবর্তে এই প্রবন্ধটি পাঠান। হু শি ও তার মত আরো অনেকে সে সময় প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা ছড়াবার জন্যই জনসাধারণকে 'ক্ল্যাসিক্স' পড়তে পীড়াপীড়ি করছিল। এদের উদ্দেশ্যে এই রচনাটি লেখা।

আগে দীর্ঘ বক্তৃতা দেবার জন্যে তাদের যে জেদ সেটা বড় বিরক্তিকর। তারা যদি এমনি কোনো কারণের কথাই জাহির করতে থাকে যা তাদের মানুষের রক্ত খাওয়ার যৌক্তিকতাই প্রমাণ করে, তাহলে বলব এটা আরো বেশি বিরক্তিকর। ভাগ্য ভাল ওদের ভাষা বুঝি না।

একটা চড়াই কি হরিণ মানুষের হাতে ধরা পড়লে সর্বদাই পালাতে চেষ্টা করে। ওদিকে পাহাড়ে ও বনে কিন্তু ঈগল ও বাজপাখি আছে, বাঘ ও নেকড়ে অবধি রয়েছে। ছোটখাটো প্রাণীরা তাই মানুষের কাছে থাকলে যতটা নিরাপদ ওখানে যে তার চেয়ে বেশি কিছু তা নয়। তাহলে তারা কেন আমাদের কাছে পালিয়ে না এসে ঈগল, বাজ, বাঘ আর নেকড়েদের ওখানে পালিয়ে যেতে চায়? কারণটা হয়তো এই যে পোকারা আমাদের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করে ওরাও শেষোক্তদের কাছ থেকে ঠিক তেমনি ব্যবহারই পায়। ক্ষুধার্ত অবস্থায় এরা আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনো যুক্তি দেখাবার ধার ধারে না, কোনো কৌশলের আশ্রয় নেয় না। সোজাসুজি কামড় লাগায়। তাছাড়া যাদের খেয়ে ফেলা হচ্ছে তাদেরও প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হয় না যে তাদের পক্ষে অন্যের খাদ্য হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত বা তাদের যে কেউ খেয়ে নেবে তার জন্যে তারা আনন্দিত বা এইরূপ বিশ্বাস নিয়েই তারা বেঁচে রয়েছে এবং মরবেও তাই নিয়ে। মনুষ্যজাতি যেহেতু এই ধরনের কার্যকলাপে অভ্যস্ত তাই ক্ষুদ্র প্রাণীরা সর্বাপেক্ষা কম অনিষ্টকরটিকেই বেছে নিয়ে, মানুষের কাছ থেকে যত দ্রুত সম্ভব ছুট লাগিয়ে নিজেদের প্রগাঢ় বিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়েছে।

মাছিরা বেশ খানিকক্ষণের প্রাথমিক গুনগুনানি আর অনর্থক হইচই অন্তে শেষ পর্যন্ত যখন অবতরণ করে তখন তার কাজের মধ্যে থাকে কেবল একটু মিষ্টি বা চর্বি চেটে নেওয়া। অবশ্য ঘা কিংবা ফোঁড়ার সাক্ষাৎ পেলে কাজটা তারা আরো ভালো ভাবে সারতে পারে। তাছাড়া যা কিছু ভালো, সুন্দর বা পরিষ্কার তার ওপর একটু নোংরা ছড়িয়ে রেখে আসাটাই তাদের বিধি। কিন্তু এরা শুধুমাত্র একটু চর্বি বা মিষ্টি চাটে বা সামান্য একটু নোংরা ছড়িয়ে রেখে আসে বলেই বোধহয় যেসব লোকের গায়ের চামড়া মোটা তারা কোনো তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে না এবং এদের নির্বিঘ্নে পালাতে দেয়। চীনারা আজো বুঝতে পারছে না যে মাছিরা রোগের জীবাণু ছড়াতে পারে। তাই এদের উচ্ছেদ করার কাজটা সম্ভবত খুব কৃতকার্য হবে না, থুড়থুড়ে বৃদ্ধ বয়স অবধি এরা বেঁচে থাকবে, আরো বেশি করে বংশ বৃদ্ধি করে যাবে।

এরা কিন্তু—আপাতদৃষ্টিতে অন্তত—যা কিছু ভালো সুন্দর ও পরিষ্কার তার ওপর নোংরা ছড়িয়ে এসে অতঃপর আগ্রহভরে নিজেদের কার্যকলাপ খুঁটিয়ে দেখে না বা নিজেরাই কলুষিত করেছে এমন কিছুর দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে ফিরে তাকিয়ে 'কি নোংরা' বলে হাসে না। অন্তত এটুকু শালীনতাবোধ তাদের আছে।

ভদ্রমহোদয়রা কি অতীতে কি বর্তমানে মানুষকে পশু বলে গালি দিয়েছে। আসলে কিন্তু অনেক ব্যাপারেই মানুষের সামনে একটা আদর্শ হিসাবে কীটদের পর্যন্ত খাড়া করা চলে।

মতামত প্রকাশ করা সম্পর্কে

স্বপ্ন দেখলাম আমি একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাসঘরে বসে প্রবন্ধ লিখব বলে প্রস্তুত হচ্ছি। শিক্ষককে জিজ্ঞেস করলাম, কি ভাবে মতামত প্রকাশ করতে হয়।

'খুব শক্ত কাজ!'—চশমার কাচের উপর দিয়ে আমার দিকে আড় চোখে চেয়ে উনি বললেন : "একটা গল্প বলি শোনো"—

"কোনো একটি পরিবারে পুত্রসন্তানের জন্ম হলে বাড়ির সবাইকে উৎফুল্ল করে তোলে। ছেলেটির বয়স এক মাস হবার পর বাড়ির লোকেরা তাকে বাইরে নিয়ে যায় অতিথিদের দেখাতে—অবশ্যই কিছু স্তুতি আশা কোরে।

"একজন বলে : 'ছেলেটা বড়লোক হবে।' তাকে তখন আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানানো হয়।

"একজন বলে : 'ছেলেটা বড় চাকুরে হবে।' তাকে তখন এর পরিবর্তে অভিনন্দন জানিয়ে কিছু বলা হয়।

"একজন বলে : 'ছেলেটা মারা যাবে।' তাকে তখন পরিবারের সকলে মিলে আচ্ছা করে পিটুনি লাগায়।

"ছেলেটা যে মারা যাবে সে বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ-ই নেই। আর সে বড়লোক হবেই, কি বড় চাকুরে হবেই, একথা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না। তবু মিথ্যাই পুরস্কৃত হয় আর যা অবশ্যম্ভাবী তার বিবৃতি প্রহার জুটিয়ে দেয়। তুমি..."

"স্যার্—আমি যদি মিথ্যা কথা না বলতে চাই আবার মারও না খেতে চাই তাহলে কি বলবো তখন ?"

"তাহলে বলবে : 'আ! ছেলেটাকে খালি দেখুন একবার! সত্যি বলছি…ও! সত্যি! ওহো। হে হে! হো হেহেহেহে!"

এমনি একজন যোদ্ধা

এমনি একজন যোদ্ধার দেখা পাওয়া যাবেই!

এখন আর ও উত্তমরূপে মাজাঘষা মাউজার কাঁধে আদি আফ্রিকাবাসীদের মত অজ্ঞ নয়, অস্থির নয় সবুজ পতাকাবাহী* হাল্কা মেসিনগান হাতে চীনা সৈন্যের মত। বৃষ-চর্ম বা পরিত্যক্ত লোহার টুকরো নির্মিত বর্মের ওপর নির্ভর করে না। নিজেকে ছাড়া ওর আর কিছু নেই, আর অস্ত্র বলতে শুধু একদা বর্বর নিক্ষেপিত বল্লম।

সারি সারি শূন্যতার মাঝে ও পদার্পণ করে, যেখানে যেই তাকে দেখে একই ভঙ্গিতে মাথা নোয়ায়। ও জানে মাথা নোওয়ানোও এক প্রকার অস্ত্র, শত্রুরা বিনা রক্তপাতে মৃত্যু ঘটাতে যা ব্যবহার করে। বহু যোদ্ধার যা মৃতুর কারণ। কামানের গোলার মতই যা নিষ্ফল করে দেয় নির্ভীকদের শক্তি। শত্রুদলের মাথার উপর ঝোলে সর্বপ্রকার পতাকা আর নিশান। সম্ভবপর সর্ববিধ খেতাবে যা অলঙ্কৃত : মানব প্রেমিক, পণ্ডিত, লেখক, বৃদ্ধ, যুবক, শিল্পানুরাগী, ভদ্রলোক...। আর তার নীচে থাকে এদের বহিরাবরণসমূহ, যাবতীয় প্রকার মনোরম শব্দ খচিত : বৃত্তি, নীতিজ্ঞান, জাতীয় সংস্কৃতি, জনসাধারণের অভিমত, তর্কশাস্ত্র, সুবিচার, এশীয় সভ্যতা ...

ও কিন্তু বল্লম তুলে নিয়েছে!

শত্রুদল এবার একসাথে ভাবগম্ভীর কণ্ঠে শপথ নেয়। বলে, তার নিজেরা নাকি 'হৃদয়বান'। অন্য সব পক্ষপাতদুষ্ট লোকের মত নয়। তারা হৃদয়বান,

---

* চিঙ রাজবংশের সময় হান সেনাবাহিনীকে, যারা যুদ্ধে অত্যন্ত অপটু ছিল, সবুজ পতাকা দ্বারা চিহ্নিত করা হ'ত।

একথা নিজেরাও যে বিশ্বাস করে সেটা নিজেদের বক্ষফলকের সাহায্যেই প্রমাণ করে দিতে পারবে বলে এদের আশা। ও কিন্তু বল্লম তুলে নিয়েছে!

হেসে পাশের দিকে বল্লমখানা নিক্ষেপ করতেই সেটা ওদের বুক ফুঁড়ে দেয়।

সবাই বিধ্বস্ত—মাটির ওপর লুটিয়ে পড়েছে। থাকে শুধু বহিরাবরণটুকু—শূন্যতা ভিন্ন যার মধ্যে আর কিছুই নেই। এই শূন্যতা কিন্তু পলাতক এবং সে-ই বিজয়ী। কারণ মানবপ্রেমিক ও অন্যান্যদের হত্যার অপরাধে ও এখন দায়ী।

ও কিন্তু বল্লম তুলে নিয়েছে!

লম্বা লম্বা পা ফেলে সারি সারি শূন্যতার মাঝ দিয়ে হেঁটে চলে। আবার সেই মাথা নোয়ানো দেখতে পায়, দেখতে পায় আবার সেই নিশান, সেই বহিরাবরণ।

ও কিন্তু বল্লম তুলে নিয়েছে!

শেষ পর্যন্ত ওর বয়স হয়, শূন্যতার সারির মধ্যে বার্ধক্যবশত প্রাণ হারায়। আসলে ও যোদ্ধাই নয়, শূন্যতারই জয়।

এরকম কোনো জায়গায় যুদ্ধের সোরগোল শোনা যাবে না। তা না যাক, শান্তি তো আছে!

শান্তি…

ও কিন্তু বল্লম তুলে নিয়েছে!

জ্ঞানী বোকা ও ক্রীতদাস

একজন ক্রীতদাস খালি লোক খুঁজত যার কাছে নিজের যত দুঃখের কথা খুলে বলতে পারবে। কাজের কাজ একমাত্র এইটাই সে করতো বা একমাত্র এইটাই করতে পারতো। তার সঙ্গে সেদিন এক জ্ঞানীর দেখা।

"হুজুর!" ক্রীতদাস বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করে, গাল বেয়ে চোখের জল গড়ায়। "জানেন, আমি একটা কুকুরের মত দিন কাটাচ্ছি। এমনও হয় সারা দিনে একবারও খেতে পেলাম না। আর যদি বা পেলাম তো সে কেবল 'কাওলিঙ'-এর খোসা যা শুয়োরেও মুখে দেবে না। আর তাও যে শুধু একটা ছোট বাটিতে করে সে কথা না হয় নাই বললাম…"

"সত্যিই তো, ভারী বিশ্রী ব্যাপার।" করুণা-বিগলিত ভাবে জ্ঞানী ভদ্রলোক বললেন।

"ঠিক তাই।" মেজাজটা ওর প্রসন্ন হয়েছে। "দেখুন না—সারা দিন সারা রাত কেবল কাজই করছি। সূর্যোদয়ের সময় জল বই, সূর্যাস্তের সময় রান্না করি; ভোরবেলা ফাইফরমাশ খাটি, সন্ধ্যেবেলা গম ভাঙি; দিনটা পরিষ্কার থাকলে জামা কাপড় কাচি, বৃষ্টিবাদল হলে ছাতা ধরি; শীতের সময় ঘর তাতাবার চুল্লি সামলাই, গরমের সময় পাখা নাড়ি। মাঝ রাতে ব্যাঙের ছাতা সেদ্ধ করি, আর মনিবের জুয়াখেলার অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে থাকি কখন কি আদেশ হয় শুনতে। তবু বখশিস মেলে না, মাঝে মাঝেকেবলফিতে..."

"আহারে! সত্যি..." জ্ঞানী লোকটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। চোখের কোণ লাল দেখায়। এক্ষুনি হয়ত কেঁদে ফেলবে।

"এমনি করে তো আর চলে না হুজুর। একটা কিছু উপায় খুঁজে বার করতেই হবে। কিন্তু কি করি বলুন তো?"

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস অবস্থার উন্নতি হবে..."

"আপনার তাই মনে হচ্ছে? আমারও আশা তাই। তাছাড়া এই যে আপনাকে আমার সব অসুবিধার কথা বললাম আর যে ভাবে আপনার সহানুভূতি আর উৎসাহ পেলাম তাতে করে ইতিমধ্যেই আমার বেশ ভালো লাগছে। বোঝা যাচ্ছে পৃথিবীতে এখনো সুবিচার পাওয়া যায়।"

কয়েকদিন পরে আবার ও বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ওর দুঃখের কাহিনী শুনতে ইচ্ছুক এরকম আরেকজনের সঙ্গে এমন সময় ওর দেখা।

চোখের জল ফেলতে ফেলতে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলে, "হুজুর! জানেন তো আমি যেখানে বাস করি তা শুয়োরের খোঁয়াড়কেও হার মানায়! আমার মনিব মানুষ বলে আমায় গণ্যই করেন না। নিজের কুকুরটাকে পর্যন্ত তিনি এর চেয়ে দশ হাজার গুণ বেশি..."

"বদমাইশি ঘুচিয়ে দাও!" এত জোরে গালাগালি দিল লোকটা যে ক্রীতদাস চমকে ওঠে। এ লোকটা একটা বোকা।

"আমার বাস করার জায়গা বলতে হুজুর, একটা ভাঙাচোরা এক ঘরওলা কুঁড়ে। স্যাঁতসেঁতে, ঠাণ্ডা আর ছারপোকা ভর্তি। যখনই ঘুমোবো বলে শুই এমন কামড়ায় কি বলব। সারা জায়গাটা থেকে দুর্গন্ধ ছাড়ে, একটাও জানলা নেই..."

"মনিবকে বলতে পারো না একটা জানলা বসিয়ে দেবার জন্যে ?"

"সেটা কি আর আমার পক্ষে সম্ভব ?"

"ও ! তা, তোমার ঘরটা কি রকম সেটা একবার দেখতে বড় ইচ্ছে করছে।"

বোকা লোকটা ক্রীতদাসের পিছনে পিছনে তার কুঁড়ে অবধি যায়। তারপর মাটির দেওয়ালের ওপর আঘাত হানতে শুরু করে।

"হুজুর। করছেন কি ?" ক্রীতদাস আতঙ্কিত।

"তোমারজন্যে একটা জানলা ফুটিয়ে দিচ্ছি।"

"এমন করে হবে না ! মনিব আমায় ভীষণ বকুনি দেবে !"

"দিক্ গে !" বোকা লোকটা আঘাত করেই চলে।

"কে আছ ? ডাকাতে বাড়ি ভেঙে ফেললো ! শীগগির এসো, তা নাহলে দেওয়াল ভেঙে ফেলবে !"...চীৎকার করতে করতে, ফোঁপাতে ফোঁপাতে ক্রীতদাস উন্মত্তের মত মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দেয়। এক ঝাঁক ক্রীতদাস বেরিয়ে আসে এবং বোকা লোকটাকে তাড়িয়ে দেয়। চেঁচামেচি শুনে খেয়াল হবার পর সর্বশেষ যে ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে আসে সেই মনিব।

"একটা ডাকাত আমাদের বাড়ি ভেঙে ফেলতে চেষ্টা করছিল। আমি চীৎকার করে উঠি ; তারপর সকলে মিলে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।" শ্রদ্ধাপূর্ণ কণ্ঠে ও বিজয়ীর ভঙ্গিতে ক্রীতদাস কথাগুলো বলল।

"খুব ভাল করেছো !" মনিব ওর প্রশংসা করে।

সেইদিনই অনেকে নিজেদের উৎকণ্ঠা জানিয়ে খবরাখবর নিতে আসে। তাদের মধ্যে জ্ঞানী ভদ্রলোকও ছিলেন।

"হুজুর, আমি নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছি, মনিবও তাই আমায় প্রশংসা করেছেন। আপনি সেদিনই বলেছিলেন যে অবস্থার উন্নতি হবে। সত্যিই আপনার অপূর্ব দূরদৃষ্টি !" খুব আশাব্যঞ্জক ও আনন্দিত ভাবে ক্রীতদাস কথাগুলো বলে।

"হ্যাঁ তা ঠিক ..." জ্ঞানী ভদ্রলোকের উত্তর। মনে হল ক্রীতদাসের খাতিরে নিজেই আনন্দিত।

খেলোয়াড়ি আচরণ কিছুদিন স্থগিত রাখার ব্যাপারে

১. বিচার্য বিষয়টি

"চিন্তাধারা'র ৫৭ নম্বর সংখ্যায় মিঃ লিন উটাং* খেলোয়াড়ি আচরণের কথা তুলেছেন। ওঁর মতে, চীনে এই চেতনার বড়ই অভাব, তাই আমাদের এখন উচিত এই কাজে উৎসাহ দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা! উনি বলছেন, "জলে পড়া কুকুরকে মেরো না"-এই শব্দ ক'টি থেকেই খেলোয়াড়ি আচরণ বলতে কি বোঝায় সে ধারণাটা সম্পূর্ণ হবে। ইংরেজী জানি না বলে এই কথাটির অন্তর্নিহিত অর্থ ভালভাবে ধরতে পারিনি। তবে "জলে পড়া কুকুরকে মেরো না" এই কথার ভিতর যদি খেলোয়াড়ি আচরণের খাঁটি প্রকৃতিটি লুকিয়ে থাকে তাহলে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আমার মত কিন্তু অন্য প্রকার। জিনিসটা যাতে দৃষ্টিকটু না হয়, অর্থাৎ বলতে চাইছি, "মাথায় অযথা ময়ূরপুচ্ছ ** গুঁজতে চাই না বলেই একথা প্রবন্ধের নামটির মধ্যে ঠিকমত উল্লেখ করিনি। সে যাইহোক, আমার মতে ব্যাপারটা এই রকম: জলে পড়া কুকুরকেও মারা যেতে পারে। যেতে পারে কেন বলব, মারাই উচিত।

২. পেটানোই উচিত এমনি তিন ধরনের জলে পড়া কুকুরের কথা

আধুনিক সমালোচকেরা অনেক সময়েই "মৃত বাঘকে পেটানো"-র সঙ্গে "জলে পড়া কুকুরকে পেটানো"-র তুলনা করেন। তাঁদের মতে এ দু'টি কাজ শুধুমাত্র ভীতুদেরই শোভা পায়। মৃত বাঘকে পিটিয়ে যারা সাহসীর ভান করে তাদের দেখে আমার ভীষণ মজা লাগে। সে যাই হোক্, জলে পড়া কুকুরকে পেটানো

* প্রতিক্রিয়াশীল লেখক।

** প্রফেসার চেন উয়ান অভিযোগ করেছিলেন যে লু শুন "মাথায় অযথা ময়ূরপুচ্ছ" গুঁজে যোদ্ধার ভান করেছেন। চেন উয়ান-এর সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তপ্রভুদের দহরম মহরম ছিল।

এত সোজা ব্যাপার নয়। আপনাকে প্রথমেই দেখতে হবে কুকুরটা কি ধরনের এবং কি করে জলে পড়লো। একটা কুকুরের জলে পড়ার প্রধান কারণ তিনটি:

(ক) ভুল করে জলে পড়ে গেছে।

(খ) কেউ ঠেলে জলে ফেলে দিয়েছে।

(গ) আপনি নিজেই হয়ত ঠেলে ফেলে দিয়েছেন।

কুকুরটার জলে পড়ার কারণ যদি প্রথম দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা হয় তাহলে আর ওটাকে মারবার জন্যে দলভারী করা অর্থহীন, এমন কি ভীরুর কাজও বলা যেতে পারে। কিন্তু ধরুন, আপনি কুকুরটার সঙ্গে লড়াই করছেন এবং নিজেই ওটাকে জলে ঠেলে ফেলেছেন। সেক্ষেত্রে কিন্তু ওটাকে বাঁশ-পেটা করাও বিন্দুমাত্র অনুচিত নয়, কারণ ব্যাপারটা প্রথমে যে-দুটো কারণের উল্লেখ করা হয়েছে তার চাইতে ভিন্ন।

ওরা বলে, একজন নির্ভীক মুষ্টিযোদ্ধা কখনো প্রতিপক্ষ ভূপাতিত হলে তাকে আঘাত করে না এবং এই সুন্দর আচরণ থেকে আমাদের প্রত্যেকেরই শিক্ষা নেবার আছে। একথা আমি মানতে পারি তবে একটা শর্ত আছে: প্রতিপক্ষকেও একজন সাহসী মুষ্টিযোদ্ধা হতে হবে। সেক্ষেত্রে একবার পিটুনি খাবার পর হয় সে লজ্জায় গা ঢাকা দেবে, নয়তো প্রতিশোধ নিতে খোলাখুলি আবার লড়াইয়ে নামবে। এই দু'য়ের মধ্যে সে যেটাই করুক না কেন কিছু অন্যায় করবে না। কিন্তু কুকুরের বেলায় একথা খাটে না, কারণ তাদেরও একই শ্রেণীভুক্ত ভাবা উচিত নয়। আসলে এরা যত বন্য ভঙ্গিতেই ঘেউ ঘেউ করুক না কেন, "ন্যায় অন্যায় বোধ"-এর এরা ধার ধারে না। তাছাড়া কুকুর সাঁতার জানে এবং ঠিক সাঁতার কেটে ডাঙ্গায় গিয়ে উঠবে। আপনি যদি সতর্ক না হন তাহলে গা ঝাড়া দিয়ে আপনার সর্বাঙ্গে জল ছিটিয়ে তারপর পিছনের দু'পায়ের মধ্যে লেজ পুরে ছুটে পালাবে। এবং এ-ঘটনা যদি আবার ঘটে সেবারও আপনার ঐ একই দশা হবে। শাদাসিধে মানুষ হয়ত ভাবে যে একবার জলে পড়াটা এক ধরনের ধর্মশিক্ষার কাজ করে এবং এরপর কুকুরটা নিশ্চয় পাপ করেছে বলে অনুশোচনা করবে, লোককে আর কখনো কামড়াবে না। একথা ভাবার মত ভুল আর দু'টো হয়না।

তাই আমার মতে যে কোন ধরনের কুকুর যারা মানুষকে কামড়ায় তাদের পেটাতে হবে। তা সে ডাঙ্গায় থাকুক, কি জলে।

৩. 'পাগ'দের* বিশেষ করে জলে ঠেলে ফেলতেই হবে এবং সেই সঙ্গে আচ্ছা করে ধোলাই

'পাগ' বা 'পেক্'দের দক্ষিণ চীনে বিদেশী কুকুর বলা হয় কিন্তু আসলে এরা এক বিশেষ প্রকার চীনা কুকুরদের বংশোদ্ভূত। আন্তর্জাতিক কুকুর প্রদর্শনীতে এরা হামেশাই সোনার পদক জেতে এবং 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র মধ্যে কুকুরদের যে ফটোগুলো আছে তার মধ্যে আমাদের চীনা 'পাগ'-দেরও অনেক ছবি রয়েছে। এও এক প্রকার জাতীয় গৌরব। কুকুর ও বেড়ালদের আমরা সাংঘাতিক শত্রু বলে জানি, কিন্তু এই 'পাগ'গুলো কুকুর হলেও ঠিক বেড়ালের মত দেখতে—এত শান্ত, অমায়িক আর আপনভোলা। এদের আত্মতুষ্টির ভাব দেখে মনে হয় এরা যেন বলতে চাইছে : "প্রত্যেকেই এক এক ধরনের চরমপন্থী, কিন্তু আমি নিজে 'মধ্যপন্থা অবলম্বনের নীতি'** মেনে চলি।" এই কারণেই ক্ষমতাশালী লোকেরা, খোজারা এবং বড়লোকের স্ত্রী ও কন্যারা 'পাগ'-কে এত ভালবাসে এবং 'পাগ'দের বংশলুপ্ত হয় না। পাগদের দেখতে খুব চতুর বলেই গলায় ছোট্ট একটা চেন পরিয়ে খুব বড়লোকী চালে সাজানো হয়। এদের একমাত্র কাজ চীনা বা বিদেশী মহিলারা যখন বাজার করতে বেরোয় তখন তাদের সঙ্গে বক্ বক্ করা।

এই কুকুরগুলোকে জলের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিতেই হবে আর তারপর বেধড়কে পিটুনি। নিজ থেকেই যদি কখনো জলে পড়ে যায়, সেক্ষেত্রেও পিটুনি লাগালে ক্ষতি হবে না। অতিমাত্রায় ধর্মভীরু হ'ন যদি মার লাগাবার দরকার নেই তবে এদের জন্য দুঃখিত হবারও কারণ নেই। আপনি যদি এদের অপরাধ মাপ করে দেন তাহলে অন্য কুকুরদের মারবার সময়ও আপনার আর ডাক পড়বে না। জানি, অন্য কুকুরেরাও বড়লোকদের তোয়াজ করে আর গরীবদের দেখে তড়পায়; তবু সেগুলোকে খানিকটা অত্যন্ত নেকড়ের মত দেখতে, কিঞ্চিৎ বন্যগোছের—এই 'পাগ'দের মত অকর্মণ্য নয়।

মূল বিষয়বস্তু থেকে একটু দূরে চলে এসেছি, এসব কথার সঙ্গে বোধ হয় আসল বক্তব্যের খুব একটা যোগাযোগ নেই।

* নাক চেপ্টা ছোট কুকুর।

** The Doctrine of the Mean—কনফুসীয় ক্ল্যাসিক

৪. জলে পড়া কুকুরদের না পেটানোর ফলে উত্তর-পুরুষদের যে ক্ষতি হয় সে সম্বন্ধে

বোঝাই যাচ্ছে জলে পড়া কোন কুকুরকে মারা হবে কিনা সেটা পুরোপুরি নির্ভর করছে কুকুরটা সাঁতরে ডাঙ্গায় এসে উঠে কেমন ব্যবহার করবে তার ওপর। একটা কুকুরের পক্ষে তার স্বভাব পরিবর্তন করা শক্ত। আজ থেকে দশ হাজার বছর পরে হয়ত অবস্থা অন্য রকম হবে কিন্তু আমি বর্তমানের কথাই বলছি। আমরা যদি ভাবি জলে পড়লে এদের বড় করুণ দেখায়, তাহলে বলতে হয় কীট-পতঙ্গগুলোর ব্যাপারেও কি একই কথা খাটে না? কলেরার জীবাণুরা কত তাড়াতাড়ি বংশবৃদ্ধি করে, অথচ দেখলে মনে হয় ভারী নিরীহ। ডাক্তাররা তো আর তা বলে এগুলোকে ছেড়ে কথা বলেন না।

আজকের দিনে রাজকর্মচারীরা আর চীনা ও বিদেশী কেতাদুরস্ত ভদ্রলোকেরা যা কিছু তাদের অসুবিধার কারণ হচ্ছে সেগুলোকে সঙ্গে সঙ্গে "রেড" বা "বলশেভিক" নামে অভিহিত করছে। ১৯১২-র আগে অবস্থাটা সামান্য একটু ভিন্ন ধরনের ছিল: প্রথম দিকে এরা কাঙ উ ওয়াই-এর* দলভুক্তদের অবাঞ্ছিত বলে অভিহিত করেছিল, তারপর করেছিল বিপ্লবী বলে। এরা তখন এদের বিরুদ্ধে খবরাখবর অবধি সরবরাহ করেছে। তার মানে এরা যেমন এক দিকে নিজেদের চাকরীর উচ্চপদ বজায় রাখার চেষ্টা করছিল তেমনি অন্যদিকে হয়ত ইচ্ছে ছিল "মানুষের রক্তে নিজেদের টুপির বোতামটা রাঙিয়ে নেবার।"** কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিপ্লব এল আর এই সব হদ্দি-তদ্বিবাজদের মধ্যে হঠাৎ নেড়ী কুত্তাদের মত ত্রাহি ত্রাহি রব পড়ে গেল, বেনী মাথায় তুলে এঁরা হাওয়া হলেন। ওদিকে বিপ্লবীরা ছিলেন ভারী আপ-টু-ডেট, ভারী 'সভ্য'। এতো 'সভ্য' যে এই তথাকথিত

* কাঙ উ-ওয়াই (১৮৫৫-১৯২৭)—চিঙ রাজত্বের শেষ দিককার একজন বিখ্যাত সংস্কারবাদী—১৮৯৮ সালের সংস্কার আন্দোলনের নেতা। কিন্তু ১৯০৮ সালে লেখা একটি প্রবন্ধে তিনি এই মর্মে ঘোষণা করে বসলেন, চীনে এখনো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মত অবস্থা আসেনি, সংবিধান নির্ভর রাজতন্ত্রই এখন প্রয়োজন।

** চিঙ রাজবংশের রাজত্বকালে প্রথম শ্রেণীর রাজকর্মচারীদের মাথায় থাকত পুঁতির মত 'কোরাল' পাথর বসানো টুপি। রাজকর্মচারীদের কেউ কেউ পদ মর্যাদা বাড়াতে বিপ্লবীদের হত্যা করেছিল।

ভদ্রলোকরাও তা অপছন্দ করতেন। এই বিপ্লবীরাই বলেছিল: "বিপ্লব সবারই জন্য। জলে পড়া কুকুরদের আমরা পেটাব না—ওদের সাঁতরে তীরে উঠতে দাও।" আর ভদ্রলোকরা তো ঠিক এইটাই চেয়েছিল। ১৯১৩-র দ্বিতীয়ার্ধ—অর্থাৎ দ্বিতীয় বিপ্লব শুরু হওয়া অবধি ভদ্রলোকের দল গা ঢাকা দিয়েই রইল। তারপর সহসা বিপ্লবী নিধনে ইউয়ান শি-কাইকে* সাহায্য করতে আবার আবির্ভূত হল। ফলে চীনের অবস্থা দিনকে দিন ক্রমশ শোচনীয় হয়ে উঠল। এখন তো আমরা সুপরিচিত চিরকেলে বদমাইশগুলো ছাড়াও অনেক তরুণ-তরুণীকেও এই দলে দেখতে পাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাতে হয় সেই সব শহীদদের যাঁরা এইসব বিষধর সাপদের খুব দয়া দেখিয়েছিলেন এবং বংশবৃদ্ধি করতে দিয়েছিলেন। যে সব তরুণরা এত দিনে একথা উপলব্ধি করতে পেরেছেন তাঁদের এখন আরো অনেক বেশি সচেষ্ট হতে হবে এবং আরো অনেক প্রাণবলি দিতে হবে—অন্ধকারের শত্রুকে তবেই রোখা যাবে।

চিঙ চিন** গুপ্তচরদের হাতে মৃত্যুবরণ করেন। বিপ্লবের ঠিক পরেই তাঁকে বীরাঙ্গনা আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এখন আর এই খেতাবটির কথা প্রায় শোনাই যায় না। বিপ্লব যখন শুরু হল সে সময় এই মেয়েটি যে জেলায় বাস করত সেখানে একজন জেনারেল আসেন। এখন আমরা যাদের "সামন্তপ্রভু" বলি তেমনি একজন। এবং তিনি আসেন মেয়েটির কমরেড হিসাবেই। এই জেনারেলের নাম ওয়াং চিন-ফা। মেয়েটির মৃত্যুর পিছনে যে লোকটি ছিল তাকে তিনি গ্রেপ্তার করেছিলেন এবং হত্যার প্রতিশোধ নিতে সাক্ষ্য-প্রমাণও জোগাড় করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু এই গুপ্তচরটিকে তিনি খালাস করে দেন।

* ইউয়ান শি-কাই (১৮৫৯-১৯১৬)—উত্তরাঞ্চলের প্রধান সামন্তপ্রভুদের একজন। ১৯১১-র বিপ্লব চিঙ রাজত্বের পতন ঘটালে ইউআন প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সমর্থনের ওপর নির্ভর করে প্রেসিডেন্ট অফ দা রিপাবলিকের পদটি দখল করে নেয় এবং ১৯১৫ সালে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে। ৎসাই-নো এর প্রতিবাদে ইউনানে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, অন্যান্য প্রদেশও সমর্থনে এগিয়ে আসে। বাধ্য হয়ে তখন ইউয়ানকে গদি ত্যাগ করতে হয়।

** ১৮৭৭-১৯০৭। একজন মহিলা বিপ্লবী। জাপানে শিক্ষাপ্রাপ্ত। মাঞ্চু বিরোধী আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়দের একজন। ১৯০৭ সালে শাওসিঙ-এ গ্রেপ্তার হন এবং তাঁকে হত্যা করা হয়।

খালাস করার কারণ ওদের সবারই ধারণা ছিল যে রিপাবলিকের যখন পত্তন হয়েই গেছে তখন আর অতীতকে নিয়ে খামোখা টানাটানি করে কোন লাভ নেই। কিন্তু দ্বিতীয় বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর ইউয়ান শি-কাইয়ের এর চর এই ওয়াঙ-কেই করে হত্যা করে। যে লোকটি চিউ চিন হত্যার পিছনে ছিল এবং ওয়াঙ যাকে মুক্তি দিয়েছিল সেই কিন্তু এ ব্যাপারে একটি বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল।

এরপর গুপ্তচরটি একদিন মহা শান্তিতে নিজ শয্যাতেই প্রাণত্যাগ করেছে। এ ধরনের অনেক মানুষের খবরদারি আজো পুরোমাত্রায় অব্যাহত আছে বলেই চিঙ চিন-এর নিজ জেলাটিতে পর্যন্ত আজ অবধি পরিবর্তন আসেনি, কোন অগ্রগতি হয়নি। এই দিক্ দিয়ে মিস্ ইয়াঙ ইন্-উ* এবং অধ্যাপক চেন ইউয়ানকে খুব ভাগ্যবান বলতে হবে কারণ তাঁরা চীনের এক আদর্শ জেলা** থেকে এসেছেন।

৫. ক্ষমতাচ্যুত ব্যক্তি আর জলে পড়া কুকুররা কিন্তু এক গোত্রের নয়

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ মানেই দয়া দেখানো। 'মার্‌কা বদলা মার্,-খুন্‌কা বদলা খুন'ই খাঁটি দাওয়াই। চীনে অবশ্য সবই উল্টোপাল্টা: জলে পড়া কুকুরদের না মেরে উল্টে আমরাই তাদের কামড় লাগাতে দিচ্ছি। সরলপ্রাণ মানুষেরা অবশ্য এরকম ব্যবহারই পাবেন।

চলতি কথায় আছে দয়া দেখানো বোকামিরই নামান্তর। হয়ত একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে তবু বলব একটু সতর্কভাবে ভেবে দেখলে বোঝা যাবে কথাটার আসল উদ্দেশ্য কিন্তু মানুষকে বিপথগামী করা নয়, অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলেই লোকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। বেকায়দায় পড়েছে এমন কাউকে আঘাত করতে অনিচ্ছুক

* ইয়াঙ ইন-উ—ন্যাশনাল উইমেনস কলেজের প্রতিক্রিয়াশীল সভাপতি। ১৯২৪ সালে এই মহিলাকে কলেজের ছাত্রীরা তাড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী চাঙ শি চাও-এর সাহায্যে অতি নীচভাবে তিনি এই প্রতিরোধ দমন করেন।

** উষি, চেন ইউয়ান যেটিকে "আদর্শ জেলা" বলে অভিহিত করেছেন।

হবার পিছনে দুটি কারণ থাকতে পারে। হয় আমাদের তেমন শক্তি নেই, আর নয়তো ভুল করেছি। প্রথম কারণটা নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়টির ব্যাপারে আমরা এই ভুলের দুটো কারণ নির্দেশ করতে পারি। এক, জলে পড়া কুকুরদের সঙ্গে ক্ষমতাচ্যুতদের এক করে দেখা। দুই, ক্ষমতাচ্যুতদের সবাইকেই এক করে দেখা, এদের মধ্যে ভাল মন্দ বিচার করে কোনো ভেদরেখা না টানা। এরই ফলে অনিষ্টকারীরা শাস্তি পায় না। বর্তমানেই দেখুন না রাজনৈতিক অবস্থার অস্থিরতার দরুণ মানুষের পদোন্নতি আর পদচ্যুতি লেগেই রয়েছে। অল্পদিনের জন্য ক্ষমতা পেয়েছে এমন কোন কর্তৃপক্ষের ওপর ভরসা রেখে একটা লোক হয়ত খুশিমত বদমাইশি করে চলেছে, কিন্তু একদিন সে আছাড় খাবেই এবং তখন দয়াভিক্ষাও চাইবে। তখন কিন্তু দেখা যাবে শাদাসিধে যেসব লোক তাকে চিনত বা তার হাতে অত্যাচারিত হয়েছে তারা লোকটাকে জলে পড়া কুকুর বলেই ভেবে নিচ্ছে, পিটুনি না দিয়ে উল্টে তারই জন্য দুঃখ বোধ করছে। তাদের ধারণা ন্যায়বিচার তো হয়েই গেছে এবার আর দয়াপরবশ হতে বাধা নেই। কিন্তু কুকুরটা যে সত্যিই জলে পড়েনি বরং অনেক আগে থেকেই গা ঢাকা দেবার আস্তানা তৈরী করে রেখেছে এবং বিদেশীদের বাসস্থানে নিজের খাদ্য সংস্থান অবধি করে রেখেছে—এ কথা তারা জানে না। কখনো কখনো ওটাকে দেখে আহত বলে মনে হয় বটে কিন্তু এটা ভান ছাড়া আর কিছুই নয়—লোকের দয়া কাড়তে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে যাতে বেশ আরামে নিজের গা ঢাকা দেবার আস্তানায় গিয়ে সেধানো যায়। পরে আবার ও বেরিয়ে আসবে, শাদাসিধে মানুষকে কামড় লাগিয়ে নতুন করে খেল শুরু করবে। করবার মত যত রকম অপরাধ আছে তার কোনটা বাদ দেবে না। এর জন্য অংশত সেই সব শাদাসিধে মানুষরাই দায়ী যারা একটা কুকুরকে জলে পড়া অবস্থায় পেটায় না। তাই কঠোর ভাবে বিচার করলে দেখা যায়, এইসব লোক নিজেরাই নিজেদের কবর খুঁড়েছে। সেই জন্যে ভাগ্যকে বা অন্য লোকদের দোষ দেবার এদের কোন অধিকার নেই।

৬. এখন আমাদের পক্ষে খুব একটা খেলোয়াড়ি আচরণ দেখাতে যাওয়া উচিত হবে না

মানবতাবাদীরা হয়ত প্রশ্ন করবেন: তাই যদি হয়, তাহলে কি খেলোয়াড়ি

আচরণ আমরা একেবারেই চাই না? এ কথার মুখে মুখে জবাব দেওয়া যায়ঃ নিশ্চয় চাই, তবে এখনো তার সময় হয়নি। নিজের বক্তব্য প্রমাণে আমি যুক্তিও দিতে পারি, অবশ্য মানবতাবাদীরা হয়ত তা কাজে লাগাতে চাইবেন না। চীনা ও বিদেশী কেতাদুরস্ত ভদ্রলোকেরা তো একথা প্রায়ই বলছেন যে, চীনের কতকগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে বলে স্বাধীনতা ও সাম্য সম্বন্ধে বিদেশী চিন্তাধারাগুলো আমাদের বেলায় ঠিক খাটে না। এ-কথাটাকে আমি খেলোয়াড়ি আচরণেরই অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নিচ্ছি। তা না হলে একজন মানুষ যদি আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে কিন্তু আপনি তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন, সেক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত আপনাকেই কষ্ট পেতে হবে। তার কাছ থেকে শুধু যে ভাল ব্যবহার পাবেন না তাই নয়, নিজে যে এর পর খারাপ ব্যবহার করবেন তারও আর সময় থাকবে না। কাজেই ভাল ব্যবহার করার আগে শত্রুকে ভালমত চেনা দরকার। সে যদি ভাল ব্যবহার পাবার যোগ্য না হয়, তা হলে বিনয় না দেখানোই ভাল। সে যদি ন্যায়সঙ্গত কাজ করে, তবেই তার সঙ্গে খেলোয়াড়ি আচরণ নিয়ে কথা বলা চলে।

কথাটা শুনে মনে হবে আমি পরস্পর বিরোধী দু'টো নীতিকে একসঙ্গে ব্যবহার করতে বলছি। কিন্তু এ ছাড়া আমার আর উপায় নেই, কারণ এটি যদি আমরা না করি তাহলে চীনের ভবিষ্যত কোনদিনই উজ্জ্বল হবে না। আমাদের এখানে এই পরস্পর বিরোধী নীতি দু'টো অনেক রকম রূপ-ই নেয়। যেমন, মনিব আর ক্রীতদাস ভেদে এবং পুরুষ আর মহিলা ভেদে এদেশে আলাদা আলাদা বিধি ব্যবস্থা আছে। তাই বলছি জলে পড়া কুকুরদের সঙ্গে জলে পড়া মানুষদের এক করে দেখলে কাজটা খুবই অবাস্তব হবে, সে সময় এখনো আসেনি। তাছাড়া এই যুক্তি তো সেই সব ভদ্রলোকেরাই দিয়েছেন, যাঁদের মতে স্বাধীনতা ও সাম্য খুবই ভাল জিনিস তবে চীনে এখনো এসব প্রয়োগ করাব সময় আসেনি। এই জন্যেই বলছি যে কেউ যদি বাদবিচারহীন ভাবে খেলোয়াড়ি আচরণ প্রত্যাশা করে সেক্ষেত্রে এই জলে পড়া কুকুরগুলো যতক্ষণ না আরেকটু মানুষ হচ্ছে ততক্ষণ আমরা অপেক্ষা করে থাকব। অবশ্যই তার মানে এই নয় যে বর্তমানে আমরা খেলোয়াড়ি আচরণ একেবারেই প্রয়োগ করতে পারব না। আগেও বলেছি এ ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল প্রথমেই নিজের প্রতিপক্ষকে চিনে নেওয়া। সেই সঙ্গে বাদবিচারেরও খানিকটা প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ, আপনার প্রতিপক্ষ কে তার ওপর-ই নির্ভর করছে আপনি তার সঙ্গে কতখানি

উচিত ব্যবহার করবেন। সে কি করে জলে পড়েছে তা নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাবার দরকার নেই—সে যদি মানুষ হয় আমরা তাকে সাহায্য করব, কুকুর হলে উপেক্ষা করব, আর বদ কুকুর হলে পেটাব। সংক্ষেপে, নিজেদের লোকের সঙ্গে আমরা মিতালি করব, আর শত্রুদের করব আক্রমণ।

যেসব ভদ্রলোক মুখে কেবল 'ন্যায়-ন্যায়' করছে, আর মনেপ্রাণে কেবল নিজের কাজ গুছোবার ইচ্ছা, তাদের সারগর্ভ কথা নিয়ে এখন আমরা মাথা না ঘামালেও পারি। এমনকি সৎ ব্যক্তিরা উচ্চকণ্ঠে যে ন্যায় বিচারের দাবী জানাচ্ছেন সেটা অবধি বর্তমানে চীনের ভাল মানুষদের কোন কাজে লাগবে না, উপরন্তু এর ফলে বদ্‌লোকগুলোই হয়ত রক্ষা পেয়ে যাবে। কারণ, বদলোকেদের হাতে যখন ক্ষমতা থাকে এবং ভাল লোকেদের তারা কষ্ট দেয়, তখন ন্যায়বিচার চেয়ে একজন যত জোরেই আর্তনাদ করুক না কেন এরা তাতে কিছুতেই কান দেবে না। আর্তনাদ আর্তনাদই থেকে যায়, আর ভাল লোকেরাও আগের মতই কষ্ট পেতে থাকে। কিন্তু ভাল লোকরা যদি একবার কখনো সুযোগ পায়ও আর বদলোকটা জলে পড়ে যায় তখন এই সৎ ন্যায়রক্ষীরাই চেঁচিয়ে ওঠে : "প্রতিশোধ নিও না!...উদারতা দেখাও!...অন্যায়ের সাহায্যে অন্যায়কে ঠেকাতে যেওনা!" এবার কিন্তু ওদের চিৎকারের ফল পাওয়া যায় কারণ, ভাল লোকে ওদের কথা মেনে নেয় আর বদলোকগুলো অব্যাহতি পায়। অব্যাহতি পেয়ে এরা অবশ্য অনুশোচনার ধার ধারে না, বরং নিজেদের এই সৌভাগ্যে একে অন্যকে ধন্যবাদই জানায়। তাছাড়া আগে থেকেই এরা গা ঢাকা দেবার আস্তানা ঠিক করে রাখে। তেল দিয়ে নেক্ নজরে পড়তেও এরা সিদ্ধহস্ত। কাজেই, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এরা আবার আগেকার মতই ক্ষমতাশালী আর বেপরোয়া হয়ে ওঠে। এরকম কিছু ঘটলে ন্যায়-রক্ষীরা আরেক বার গলা ছাড়তে পারেন বটে কিন্তু এবার আর কেউ তা শুনবে না।

সে যাই হোক, একথা অবশ্য সত্যি যে অতি উৎসাহী বিদ্বানরা অনেক সময় নিজেরাই নিজের পায়ে কুড়ুল মারেন। যেমন হান রাজ বংশের শেষের দিকের বা মিঙ রাজ বংশের সময়কার বিদ্বানরা মেরেছিলেন। এইসব বিদ্বান ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করার সময় সাধারণত পূর্বোক্ত প্রসঙ্গটাই বারবার তোলা হয়। কিন্তু অন্য পক্ষ যে ভালো লোকদের দুচক্ষে দেখতে পারে না, তার জন্য কেউই তাদের তিরস্কার করে না। আলো আর অন্ধকারের মধ্যে লড়াইয়ের চূড়ান্ত ফয়সালা যদি না হয় আর সাদাসিধে মানুষরা যদি 'মাপ করে দেওয়ার'

সঙ্গে 'অন্যায়ের লাগাম ছেড়ে দেওয়া' গুলিয়ে ফেলে ভুল করতে থাকেন এবং বদমাইশদের থালি ক্ষমা-ই করে যান তাহলে বর্তমানে যে বিশৃঙ্খল অবস্থা চলছে তা আর কোন দিনই ঘুচবে না।

৭. ওরা অন্য লোকের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করে, আমাদেরও ওদের সঙ্গে ঠিক তেমনটি করা সম্বন্ধে

এক একজন চীনা ব্যক্তি প্রাচীনকাল থেকে চালু চীনা ওষুধ বিশ্বাস করেন, আবার এক একজন বিদেশী ওষুধ। আমাদের বড় বড় শহরে এই দু'রকম ডাক্তারই রয়েছেন, কাজেই রোগী তার পছন্দ মত বেছে নিতে পারে। এটা আমি পুরোপুরি সমর্থন করি। অন্যান্য ক্ষেত্রেও যদি ঠিক এই ব্যাপারটা চালু থাকত তো হলপ করে বলতে পারি নালিশের সংখ্যা কমে যেত এবং আমরা হয়ত তখন শান্তি ও সমৃদ্ধির মুখ দেখতাম। যেমন ধরুন, এখন অভ্যর্থনা জানাবার চলতি উপায় হচ্ছে মাথা নীচু করা (bow), কিন্তু এতে যদি কারুর আপত্তি থাকে সে তখন প্রণাম (kowtow) করতে পারে। নতুন ফৌজদারী আইনে পায়ের তলায় বেত মেরে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা নেই সত্যি, কিন্তু কেউ যদি শারীরিক ভাবে শাস্তি দেবার পক্ষপাতী হয় তাহলে আইন ভাঙবার পর সে স্বচ্ছন্দে পশ্চাদ্দেশ বাড়িয়ে সেখানে বিশেষ ভাবে কিছু লাঠির বাড়ি গ্রহণ করতে পারে। বর্তমানে বাটি, খাবার কাঠি এবং রাঁধা খাবারেরই চল কিন্তু কেউ যদি পুরাতনকে ফিরে পেতে খুব ব্যগ্র হয় তার আর তখন কাঁচা মাংস খাবার কোন বাধা থাকবে না। তাছাড়া যেসব ভদ্রলোক ইয়াও এবং শুনের* যুগকে ভারী প্রশংসা করে তাদের জন্য আমরা না হয় বেশ কয়েক হাজার খড় ছাওয়া কুঁড়ে ঘর তৈরী করে দেব। তারপর বিরাট বিরাট বাড়িতে বাস করা ঘুচিয়ে তাদের কুঁড়েঘরে নিয়ে যাব। তাছাড়া বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার যারা বিরোধী তাদের আমরা নিশ্চয়ই গাড়ি চড়ে বেড়াবার জন্যে চাপ দেব না। এ কাজগুলো করতে পারলে কারুর আর নালিশ করার থাকবে না, কারণ সবাই তখন সন্তুষ্ট হবে আর আমরা নিজেরাও শান্তি ও নীরবতা উপভোগ করব।

* কিংবদন্তিতে আছে প্রাচীন চীনের এই দুই শাসক খড় ছাওয়া কুঁড়ে ঘরে বাস করত। প্রাচীন পুস্তকে তার উল্লেখ আছে।

কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, একাজ কেউই করে না। উল্টে নিজেকে দিয়ে তারা অন্তের বিচার করে আর তার ফলস্বরূপ এই পৃথিবীতে যত রকম সম্ভব ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে খেলোয়াড়ি আচরণের ফলে গণ্ডগোল বাধার তো খুবই সম্ভাবনা। এমন কি অন্যায়কারী যেসব শক্তি রয়েছে তারা পর্যন্ত এর সুযোগ নিতে পারে। যেমন ধরুন, উইমেন্‌স্ নরমাল্ কলেজের ছাত্রছাত্রীরা যখন লিউ পাই-চাও* মারধোর করল এবং গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল তখন কিন্তু 'মডার্ন রিভিউ' একবারও চিঁ চিঁ করল না। কিন্তু এরপর ছাত্রছাত্রীরা যখন হোস্টেল দখল করে নিলেন এবং প্রফেসার চেন ইউয়ান তাঁদের সেখানে থাকতে উৎসাহিত করলেন, পত্রিকাটা লিখল: "ধরুন, ওরা হোস্টেল ছাড়তে চাইল না, তখন? নিশ্চয়ই আপনি তখন জোর করে ওদের জিনিসপত্র টেনে বার করে দেবেন না?" প্রথমবার লিউ পাই-চাও যখন ছেলেদের মারধোর করেছিল, জিনিসপত্র বার করে দিয়েছিল, এরা তখন মুখ খোলেনি। এবার তাহলে এরা কি করে ভাবল যে মুখ না খুললে আর চলছে না? এর কারণ উইমেনস্ নরমাল কলেজে খেলোয়াড়ি আচরণের চল আছে বলেই এরা মনে করে। কিন্তু এই খেলোয়াড়ি আচরণ দেখা যাচ্ছে একটা বাজে ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ শুধু চাঙ শি-চাও-এর অনুগামীদের রক্ষা করতেই দেখা যাচ্ছে এটাকে ব্যবহার করা হয়েছে।

৮. সিদ্ধান্ত

আমাকে হয়ত অভিযোগ শুনতে হবে যে, প্রাচীন ও নবীন বা অন্য কোন কোন মতাদর্শের মধ্যে এই বিতর্ক জুড়ে দিয়ে আমি গণ্ডগোল পাকাচ্ছি, পরস্পরের মধ্যের শত্রুতা বাড়াচ্ছি এবং দ্বন্দ্ব আরো তীব্র করে তুলছি। কিন্তু একথা আমি নিশ্চিন্ত ভাবে বলতে পারি যে যারা সংস্কার বিরোধী তারা সংস্কারকদের আঘাত করবার চেষ্টায় এ পর্যন্ত কখনো ঢিলে দেয়নি এবং সর্বদাই চরম অনিষ্ট করে এসেছে। সংস্কারকরাই কেবল ঘুমিয়ে রয়েছে আর তার জন্যে ফলভোগও করছে। এই জন্যেই চীনে সংস্কার বলে কখনো কিছু হয়নি। এবার থেকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌশল না পাল্টালেই নয়।

---

* ১৯২৫ সালে শিক্ষা মন্ত্রী চাঙ শি-চাও উইমেনস নরমাল কলেজ বন্ধ করে দিয়ে সেই চত্বরের মধ্যে লিউ পাই-চাও-এর কর্তৃত্বাধীনে মেয়েদের জন্য অন্য একটা কলেজ খোলা হয়। তারই কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে লিউ গুণ্ডা পাঠিয়েছিল।

কয়েকটি নীতি কথা

যে শহরে আমার জন্ম হয়েছিল সেখানে খুব একটা মাংস খাওয়ার চল নেই। দিনে বোধহয় দু চারটে ছাগল কেবল কাটা হয়। পিকিং কিন্তু বাস্তবিকই জনসমুদ্র, এবং এখানকার হালচালও অন্যরকম—যেখানেই যাবেন মাংসের দোকান চোখে পড়বে। একেবারে তুষার-শুভ্র জন্তুর পালও প্রায়ই রাস্তায় ভীড় করে, তবে এগুলো সবই ভেড়া। ছাগল খুবই বিরল। শুনছি পিকিঙে ছাগলের দর বেশি কারণ এরা ভেড়াদের চেয়ে বুদ্ধিমান এবং পালকে পাল ভেড়াকে নিজেদের খুশিমত চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে, ভেড়ারা বাধ্যের মত ওদের অনুসরণ করে। তাই মেষপালকেরা যদিও দু'চারটে ছাগল পোষে তারা কিন্তু ওদের নেতা হিসাবেই ব্যবহার করে এবং কখনো মারে না।

আমি একবার মাত্র একটি ছাগল দেখেছিলাম। সত্যিই সে এক পাল ভেড়ার শীর্ষস্থান অধিকার করে এসেছিল, গলায় ছিল একটা ঘণ্টা—বুদ্ধিজীবীর তকমা। সাধারণত মেষপালকেরাই ভেড়াদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। ভেড়াগুলো লম্বা এক সারির মধ্যে ধাক্কাধাক্কি, গুঁতোগুঁতি আর জড়াজড়ি করে, সবারই মুখে থাকে অতি বাধ্যের ভাব, সামনে যাই থাকুক না কেন ছোট ছোট পদক্ষেপে মেষপালককে অনুসরণ করে। ওদের গুরুগম্ভীর ব্যস্তসমস্ত ভাব দেখে সর্বদাই আমার ভারী বোকার মত একটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছা যায়:

"তোমরা কোথায় চলেছো?"

মানুষের মধ্যেও ছাগল আছে। নিজেদের গন্তব্যস্থল অবধি জনগণকে এরা ক্রমান্বয়ে আর নীরবে এগিয়ে নিয়ে যায়। ইউআন-শি-কাই এটা বুঝত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বুঝেও সে খুব একটা বুদ্ধিমানের মত তার সদ্ব্যবহার করেনি—হয়তো সত্যিকার সূক্ষ্ম কায়দা বোঝা ও তা প্রয়োগ করার মত সে বিদ্যে ধরত না। এনার পর যে সামন্তপ্রভুরা এসেছিলেন তাঁরা ছিলেন আরোই নির্বোধ। কেবল যুদ্ধ করতে আর কান ফাটানো কাতর চীৎকারের মধ্যে একে অন্যকে জংলীর মত হত্যা করতে জানতেন। ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছিল স্বৈরাচারের, উপযুক্ত পণ্ডিতদের নিন্দে এবং শিক্ষাব্যবস্থা তছনছ করার

জন্যেও লোকে তাদের দায়ী করেছিল। যাই হোক, আমৃত্যুকাল মানুষের শেখার বিরাম নেই। বিংশ শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ যখন পার হয়ে গেছে, গলায় ঘণ্টি লাগানো জ্ঞানী লোকটা শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় উন্নতি করবে। এই মুহূর্তে ছোটখাটো কিছু কিছু ক্ষুদ্র পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হলেও তাতে কিছু আটকাবে না।

তারপর সেই বিশেষ দিনটি এলে দেখা যাবে ইতিমধ্যেই সবাই—বিশেষ করে তরুণের দল আইন কানুন মেনে চলতে শুরু করেছে। "রাইট পথ" ধরে ওরা তখন এগোবে। কেউ কোলাহল করবে না, অস্থির হবে না। আমি অবশ্য ধরে নিচ্ছি ইতিমধ্যে কেউই ওদের প্রশ্ন করবে না :

"তোমরা কোথায় যাচ্ছ ?"

*

কোন কোন ভদ্রলোক বলতে পারেন : "ভেড়া ভেড়াই থাকবে। লম্বা সারির মধ্যে বাধ্যভাবে পিছু পিছু চলা ছাড়া তারা আর কি করতে পারে ? তোমরা কি কোনদিন শুয়োর দেখনি ? প্রথমে নড়তে চায় না, ছুটে পালায়, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে, পাগলের মত এদিক ওদিক তেড়ে যায়—শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাদের যেখানে যাবার কথা সেখানেই নিয়ে যাওয়া হয়। ওদের যত বিদ্রোহ সবই খালি শক্তির অপচয়।"

অর্থাৎ বলতে চাওয়া হচ্ছে : মরতে যদি তোমায় হয়ই, ভেড়ার মতই মরো। তাহলে শান্তিও রক্ষা করা যায় আর দু' তরফই ঝামেলার হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়।

এটা সত্যিই একটা প্রশংসনীয় পরিকল্পনা। কিন্তু আপনি কি কোন দিন বুনো শুয়োর দেখেননি ? তারা নিজেদের দাঁতদুটোর জোরে অভিজ্ঞ শিকারীকে পর্যন্ত কাছে ঘেঁষতে দেয় না। শুয়োর যদি তাদের প্রতিপালকদের তৈরী খোঁয়াড় থেকে পালাতে পারে এবং পাহাড়ে চলে যায়, তাহলে বেশি দিন লাগবে না তাদেরো অমনি দাঁত গজাবে।

*

মিস্টার শোপেনহয়ের একবার ভদ্রলোকদের শজারুর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন —তুলনাটা একটু স্থূল বলে আমার মনে হয়। কোন খারাপ উদ্দেশ্য অবশ্যই তাঁর ছিল না—একটা সাদৃশ্য কেবল খাড়া করেছিলেন। তাঁর 'পারেরগা উন্‌ড্ পারালিপোমেনা'য় তিনি অনেকটা এই রকমই লিখেছেন : কয়েকটা শজারু

শীতকালে ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পেতে এক সাথে ঘন হয়ে বসে উত্তাপ ভোগ করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু একে অন্যের গায়ের কাঁটা লেগে এত বিশ্রীভাবে তারা বিদ্ধ হ'ল যে সঙ্গে সঙ্গে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তারপর উত্তাপের তাগিদ আবার তাদের কাছাকাছি টেনে আনল এবং এবারো তারা আগের মতই কষ্ট পেল। যাই হোক্ এই উভয় সঙ্কটকালীন অবস্থার মধ্যেই তারা একটা নিরাপদ ব্যবধান আবিষ্কার করে ফেলেছিল এবং এই ব্যবধান বজায় রেখে শান্তিতে বাস করছিল। এখন মানুষ যে একত্রিত হয়েছিল তার কারণ তাদের সামাজিক চাহিদা। কিন্তু তাদের প্রত্যেকেরই বহু বিরক্তিকঁর অভ্যাস আর অসহনীয় ত্রুটি ছিল বলে পরে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এক সাথে বাস করার উপযোগী সঠিক পারস্পরিক ব্যবধান অবশ্য শেষ পর্যন্ত তারা ঠিকই আবিষ্কার করেছে—একেই আমরা এখন "এটিকেট" আর "মার্জিত আচার-আচরণ" বলি। ইংল্যাণ্ডে যারা এই সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলোকে উপেক্ষা করে তাদের সতর্ক করে ব'লে দেওয়া হয়: "দূরত্ব বজায় রাখো!"

কিন্তু এ-ধরনের সতর্কীকরণ অবধি একমাত্র শজারুদের মধ্যেই বোধ হয় কার্যকর, কারণ তারা যে একে অন্যের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখে সে শুধু খোঁচা খেতে চায় না বলে, সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে বলে নয়। গায়ে কাঁটা নেই এমন কোন জন্তু যদি শজারুদের দলে যোগ দিত তাহলে সে চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে ফেললেও শজারুরা তার গায়ে গা ঠেকিয়ে টিপুনি দিত। কনফুসিয়াস বলেছিলেন, "শিষ্টাচারের বিধি সাধারণ মানুষদের জন্যে নয়"। কাজেই আশ্চর্যের আর কি যে জনসাধারণ ভদ্রলোক হতে চাইছে।

অবশ্যই, এই শজারুদের আপনি দাঁত বা শিং, মুগুর বা লাঠির সাহায্যে প্রতিহত করতে পারেন। এই শজারু সমাজের বিধান কিন্তু আপনাকে তখন "নীচু ঘরের লোক" বা "উদ্ধত" বলে চিহ্নিত করবে। এটা মেনে নেওয়ার জন্তে আপনার তৈরী থাকা উচিত।

বিবর্ণ রক্তচিহ্নের মাঝে

কেউ মৃত, কেউ জীবিত
আর এখনো ভূমিষ্ঠ হয়নি
এমনি কজনের স্মৃতির উদ্দেশে।*

[* ১৮ই মার্চের ঘটনার পর এটা লেখা হয়। সে সময় উত্তরাঞ্চলের সামন্তপ্রভু তুয়ান চি-জুই পিকিঙের ছাত্র ও নিরীহ অধিবাসীদের ওপর পুলিশকে গুলি চালাবার হুকুম দেয়। জাপানী, ইংরেজ ও মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে এঁরা তখন বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিলেন। সাতচল্লিশ জন প্রাণ হারান একশো পঞ্চাশ জন আহত হন]

সৃষ্টিকর্তাকে এখনো পর্যন্ত ক্ষীণজীবী-ই বলা চলে।

গোপনে স্বর্গমর্তের যে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে তা তাঁরই দৌলতে, কিন্তু এই জগৎটাকে ধ্বংস করতে তিনি সাহস পান না। গোপনে জীবন্ত প্রাণীরা যে প্রাণ হারাচ্ছে তা তাঁরই দৌলতে কিন্তু তাদের মৃতদেহগুলোকে সংরক্ষিত করে রাখতে তিনি সাহস পান না। গোপনে মানব জাতির যে রক্তক্ষরিত হচ্ছে তা তাঁরই দৌলতে কিন্তু রক্তচিহ্ন চিরকালের মত তাজা রাখতে তিনি সাহস পান না।

উনি শুধু নিজের দলের লোকদের সুখ সুবিধাগুলোই দেখেন, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যারা ক্ষীণজীবী তাদের। অট্টালিকা সমূহের গরিমা বাড়াতে তাই তুলনামূলক ভাবে পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষ ও নির্জন সমাধিস্তূপকে ব্যবহার করা হয়। সময়কে ব্যবহার করা হয় যন্ত্রণা আর রক্তচিহ্নকে ক্ষীণ করে দিতে। প্রতিদিন অল্প একটু মিষ্টি দেওয়া কটু মদ ঢালা হয় কাপে—পরিমাণে না বেশি না কম—যাতে সামান্য একটু ঘোর লাগে।

মানবজাতিকে এটা যে তিনি দিচ্ছেন তার কারণ যারা খাবে তারা কাঁদবে ও গান গাইবে; একই সঙ্গে ভদ্র ও মাতাল, সচেতন ও অসচেতন, বাঁচতেও যেমন আগ্রহী আর মরতেও তেমন আগ্রহী—সবই হবে। প্রাণীদের বাঁচবার তাগিদটাকে তাঁকে জিইয়ে রাখতে হবেই। এখনো পর্যন্ত ওঁর মানবজাতিকে ধ্বংস করার মতো সাহস নেই।

গুটিকয়েক পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষ ও নির্জন সমাধিস্তূপ পৃথিবীর ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, বিবর্ণ রক্তচিহ্নের মধ্যে যার প্রতিফলন দেখা যায়। এখানে যে মানুষ তার অস্পষ্ট বেদনা আর দুঃখের একটা আস্বাদ পায় তাই নয় অন্যেরটাও জানতে পায়। তবু তারা এসব ঘৃণা ভরে পায়ে করে ঠেলে দেবে না। ভাবটা, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। তাছাড়া এই বেদনা ও দুঃখের আস্বাদ লাভ করাটাকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করতে তারা নিজেদেরকে ভাগ্যের বলি বলে আখ্যা দেয়। নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করে আবার কখন নতুন করে দুঃখ ও বেদনা আসে। আসে নতুন কষ্ট। এটা তাদের বিহ্বল করে ঠিকই কিন্তু এরই জন্যে তারা আবার মুখিয়েও থাকে।

এরা সবাই সৃষ্টিকর্তার বিনীত প্রজা। উনি তো চান এরা এমনিই হোক।

মানবজাতির মধ্যে এবার কিন্তু একজন বিদ্রোহী যোদ্ধার আবির্ভাব হয়েছে। সে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে কি অতীতের কি বর্তমানের যাবৎ পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষ আর নির্জন সমাধিস্তূপের আসল স্বরূপটি ধরে ফেলেছে। তীব্র অন্তবিহীন যাবতীয় নিদারুণ যন্ত্রণার কথা তার স্মরণে আছে; চারধার জুড়ে ছিটানো জমাট রক্ত তার চোখে পড়েছে। যা জীবন্ত, যা মৃত, এমন কি যা এখনো ভূমিষ্ঠ হয়নি তাও তার বোধগম্য। এবার সে এগিয়ে আসবে মানবজাতিকে—সৃষ্টিকর্তার এইসব বিনীত প্রজাকে রক্ষা কিংবা ধ্বংস করতে।

সৃষ্টিকর্তা—সেই ক্ষীণজীবীটা লজ্জায় নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছে। যোদ্ধার চোখে এবার স্বর্গ আর মর্তের রঙ-ই পাল্টে গেছে।

সাহিত্য ও বিপ্লব*

৪ঠা এপ্রিল, ১৯২৮

প্রিয় মিঃ তুঙ-ফেন্,

সমালোচক নই বলে আমি শিল্পীও নই, কারণ আজকের দিনে কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে হলে সঙ্গে সঙ্গে সমালোচকও হতে হবে। আর

* পিকিঙ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের চিঠির উত্তর।

নয়তো এমন একজন বন্ধুর প্রয়োজন যে সমালোচক। পৃষ্ঠপোষক না থাকলে আপনি অসহায়। নিদেন পক্ষে শাংহাইবাসীদের বেলায় বর্তমানে কথাটা খাটে। আমি শিল্পী নই বলেই শিল্পের প্রতি তেমন শ্রদ্ধাভক্তি পোষণ করি না। করবোই বা কেন, হাতুড়ে ডাক্তার ভিন্ন আর কেউ কি মুষ্টিযুদ্ধের আসর বসায় তার ওষুধের অব্যর্থতা প্রমাণ করতে? আমার মনে হয় এ ব্যাপারটার একটা সামাজিক তাৎপর্য আছে—কালের গতিটাই এখন এই রকম। মানব সমাজের যদি অগ্রগতি হয় তাহলে সে আপনি বাহ্য জগতের বিষয়েই লিখুন বা হৃদয়ের কথাই লিখুন, রচনাগুলোর সেকেলে হয়ে পড়া বা অবলুপ্তি কিন্তু অবশ্যম্ভাবী। আজকালকার সমালোচকরা কিন্তু এই ব্যাপারে আতঙ্কগ্রস্ত—তাঁরা অবিনশ্বরতা অর্জনে বদ্ধপরিকর।

বিভিন্ন 'ইজ্‌ম্' যে গজিয়ে উঠছে সেটা যেমন একটা অবশ্যম্ভাবী ঘটনা তেমনি একটার একটা বিপ্লব যখন ঘটেই চলেছে তখন বিপ্লবী সাহিত্যের উপস্থিতিও সুনিশ্চিত। বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে জাগরণ এসেছে, এবং এদের মধ্যে অনেকগুলি দেশের যদিও এখনো অবধি কোণঠাসা অবস্থা—কয়েকটি দেশ কিন্তু ক্ষমতা লাভ করেছে। কাজেই স্বাভাবিক ভাবেই জনপ্রিয় সাহিত্যও সৃষ্টি হয়েছে—আরো খোলাখুলি ভাবে বললে যাকে চতুর্থ শ্রেণীর সাহিত্য* বলা চলে।

আমি চীনা সমালোচনা সাহিত্যের বর্তমান ধারাগুলো সম্বন্ধে পুরোপুরি অবহিত নই—আর তার জন্যে খুব আগ্রহান্বিতও নই। কিন্তু যা শুনছি ও দেখছি তা থেকে এইসব বিশেষজ্ঞদের বিচার পদ্ধতির মানদণ্ড মনে হচ্ছে এক একটি এক এক রকম: অ্যাংলো-আমেরিকান, জার্মান, রাশিয়ান, জাপানী এবং চীনা পদ্ধতি তো আছেই, আর তা না হলে সবগুলোর সংমিশ্রণ আছে। কেউ সত্য-র দাবীদার আর অন্যেরা সংঘর্ষের। কেউ বলছে সাহিত্যকে যুগজয়ী হতে হবে, আর অন্যেরা লোকের পিছনে বিদ্রূপাত্মক উক্তি ছুঁড়ছে। এর পরও যারা নিজেদের সাহিত্য বিষয়ক পণ্ডিত রূপে খাড়া করেছে তারা কিন্তু নিজেরা ছাড়া অন্য কেউ যদি লেখকদের উৎসাহিত করে তখন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। এটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, কারণ কিছু যদি লেখাই না হয় তাহলে আর সমালোচনা করার থাকে কি?

* অর্থাৎ প্রলেতারীয় সাহিত্য।

অন্ত সব প্রশ্ন বর্তমানের মত না হয় নাই বিবেচনা করলাম। যে সব ব্যক্তিকে আজকাল বিপ্লবী সাহিত্যিক বলে অভিহিত করা হচ্ছে তাদের দেখছি হয় 'রণং-দেহি' ভাব, নয়তো বাস্তব অপেক্ষা আরো বড় সত্য আছে এই বিশ্বাসে তারা বিশ্বাসী। আসলে যুগজয়ী হবার নাম করে বর্তমানকে উপেক্ষা করা একপ্রকার পলায়নী প্রবৃত্তি। এই রাস্তায় সচেতন ভাবেই হোক বা অন্য কোনো ভাবে হোক এরা ঠিক পা বাড়াবে কারণ, এদের বাস্তবের মুখোমুখি হবার মত সাহস নেই অথচ নিজেদের বিপ্লবী বলে লোকদেখানো কায়দাটুকু করতে ছাড়ে না। আপনি যদি এই জগতে বসবাস করেন তাহলে এখান ছেড়ে পালান কি করে। একথা বলা আর নিজের হাতে নিজের কান টেনে আমি মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠতে পারি বলা—দু'ই সমান ভণ্ডামি। সমাজ যদি স্থিতিশীল হয় শিল্প আপনা হতে ডানা ঝাপটে অগ্রসর হতে পারে না। স্থিতিশীল সমাজে শিল্পের বিকাশ লাভ মানে সে সমাজের তা মেনে নেওয়ায় কোন বাধাই নেই এবং তা বিপ্লবী চরিত্রেরও নয়। এর ফলে একমাত্র কাট্‌তি বাড়ানো বা অর্থকরী ভিত্তিতে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় লেখা ছাপানোর সুবিধাটুকু আদায় করা ছাড়া কোন লাভ হয় না।

সংগ্রাম করাই উচিত বলে আমি মনে করি। মানুষ নির্যাতিত হলে সংগ্রাম করবে না কেন? খাঁটি ভদ্রলোকেরা কিন্তু এই ব্যাপারটাকে আতঙ্কের চোখে দেখেন। 'চরম' বলে এটির বিরুদ্ধে তাঁরা অভিযোগ আনেন। বলেন, একদল দুশ্চরিত্র যদি দুর্নীতি না প্রচার করত তাহলে মানুষ মাত্রেই বাদ্‌বিচারহীন ভাবে পরস্পরকে ভালবাসতে পারত। পেট-ভর্তিরা উপোসীদের ভালবাসলেও বাসতে পারে কিন্তু উপোসীরা পেট-ভর্তিদের ভালবাসে না। হুয়াঙ চাও*-এর সময় মানুষ মানুষের মাংস খেয়েছে, এর থেকেই আন্দাজ করা যাচ্ছে যে উপোসীরা উপোসীদের পর্যন্ত খাতির করে না, এবং এর সঙ্গে "সংগ্রাম"-এর সাহিত্যের কোন সংস্রব নেই। সাহিত্যের স্বর্গ-মর্ত তোলপাড় করার মত ক্ষমতা আছে বলে আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। তবে লোকে যদি তা অন্য কোন কাজে লাগাতে চায়, সেক্ষেত্রে আমার কিছু বলার থাকতে পারে না। উদাহরণ

* তাঙ রাজত্বের শেষ দিককার একটি কৃষক বিদ্রোহের নেতা।

স্বরূপ এই ধরুন, তাঁরা এটিকে "প্রোপাগ্যাণ্ডা"র কাজে লাগাতে পারেন।

আমেরিকান লেখক আপ্টন সিনক্লেয়ার মনে করেন সাহিত্য মাত্রেই প্রোপাগ্যাণ্ডা। আমাদের এখানকার বিপ্লবী লেখকরা এই উক্তিটিকে মহামূল্যবান জ্ঞানে সু-সংরক্ষিত করে রেখেছেন, বড় বড় অক্ষরে এটিকে ছাপিয়েছেন, আর কঠোর সমালোচকরা লেখককে "মামুলি সোশ্যালিস্ট" বলে আখ্যা দিয়েছেন। আমি নিজেও মামুলি কিনা, তাই আপ্টন্ সিনক্লেয়ারের সঙ্গে আমি একমত। যে কোন একজনের কাছে পেশ করা মাত্র সব সাহিত্যই প্রোপাগ্যাণ্ডা হয়ে পড়ে। এমন কি ব্যক্তিকেন্দ্রিক রচনাও যে মুহূর্তে লিপিবদ্ধ হ'ল, তৎক্ষণাৎ তার বেলায়ও একথা খাটবে। সত্যি, এ উপদ্রব এড়াবার একমাত্র উপায় কিছু না লেখা, কোন কথাটি না বলা। তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে সাহিত্যকেও বিপ্লবের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা চলে।

আমি কিন্তু মনে করি একজন লেখককে তাড়াহুড়ো করে চিহ্নিত করার আগে তাঁর বক্তব্যের বলিষ্ঠতা ও শিল্প নৈপুণ্যের খোঁজটা নেওয়া উচিত। তাও শিয়াঙ ৎস্যুন ও লু কাও চিয়েন *-এর মত মার্কামারা পুরোনো দোকানগুলো অবধি এখন তাদের আকর্ষণ হারিয়েছে, তাই সন্দেহ হয় "দরিদ্রা সম্রাজ্ঞীর জুতোর দোকান" কি আর "সম্রাজ্ঞীর জুতোর দোকানের"-এর চেয়ে বেশি খরিদ্দার-ধন্য হবে! বিপ্লবী লেখকরা "টেক্‌নিক"-এর কথা ওঠা মাত্র সিঁটিয়ে যান। আমার ধারণাটা অবশ্য এই যে, যদিও সাহিত্য মাত্রেই প্রোপাগ্যাণ্ডা কিন্তু প্রোপাগ্যাণ্ডা মানেই সাহিত্য নয়; যেমন আর কি সব ফুলেরই রঙ আছে (শাদাটাকেও আমি রঙ বলে ধরি), কিন্তু রঙিন জিনিস মাত্রেই ফুল নয়। ক্যাচওয়ার্ড, স্লোগান, বিজ্ঞপ্তি, টেলিগ্রাম ও পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও বিপ্লব সাহিত্যকে চায়—এবং চায় যে তা সে সাহিত্য বলেই।

কিন্তু চীনের তথাকথিত বিপ্লবী সাহিত্যকে এর আবার ব্যতিক্রম বলে মনে হয়। ব্যবসার নাম লেখা ফলকটা টাঙানো হয়েছে, আমাদের লেখকরা একে অন্যের পিঠ চাপড়াতেও ব্যস্ত, কিন্তু আজকের দিনের স্বৈরাচার আর অন্ধকারের দিকে স্থিরসংকল্প নেত্রে চেয়ে দেখতে তাঁদের সাহসে কুলোচ্ছে না। কিছু কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাঁর অধিকাংশই মুদ্রিত সংবাদ সমূহের

* পিকিঙের নামকরা মিষ্টির দোকান

চাইতেও কাঁচা হাতের লেখা। আর তা না হ'লে নাটকের যত কিছু ঘটনা আর শব্দগুচ্ছ নামে অভিনেতাকে কিন্তু আসলে অভিনেতার স্রষ্টিকর্তা স্বয়ং লেখককেই অলঙ্কৃত করছে। তা যদি হয় তবে তো নিশ্চয় ব্যক্ত চিন্তাধারা তারী বৈপ্লবিক গোছের! বেশ—এবার তাহলে কেও নাই চো'র নাটকের শেষ দুটি অতুলনীয় লাইন উদ্ধৃত করার অনুমতি দিন্।

বেশ্যা : আর আমি কখনো অন্ধকারকে ভয় পাব না।

চোর : চল তবে। ওদের রুখতে হবে।"

লু শুন

ফলক

আজকালকার চীনা লেখকদের নিত্য নতুন সব শব্দের প্রচলন করা, অথচ তার কোন ব্যাখ্যা না দেওয়াটা সবচেয়ে ভীতিপ্রদ ব্যাপার হয়ে উঠেছে।

আর, সবাই যে যার খুশিমত তার মানে করছে। নিজের সম্বন্ধে বেশি বেশি লেখা "এক্সপ্রেসানিজম্"। অন্যের সম্বন্ধে লেখা "রিয়ালিজ্ম্"। একটি মেয়ের পা'কে বিষয় করে কবিতা মানে "রোমান্টিসিজম্"। একটি মেয়ের পা'কে বিষয় করে কবিতা লেখা নিষিদ্ধ করা "ক্ল্যাসিসিজ্ম্"। আর—

আকাশ থেকে খসে পড়ে একটা মুণ্ড,
একটা ষাঁড় মাথায় ভর রেখে দাঁড়িয়ে—
হায় রে!
সাগরের সবুজ বজ্র উড়ে উড়ে যায়রে।...

এটা "ফিউচারিজ্ম্"...ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতঃপর ঝগড়াঝাটি বাধে। এই "ইজ্ম্" টা ভাল, ওটা মন্দ...ইত্যাদি ইত্যাদি।

দু'জন খর্বদৃষ্টি লোকের, তাদের মধ্যে কে অপেক্ষাকৃত ভাবে ভাল দেখতে পায় জানতে চাওয়া নিয়ে গ্রামাঞ্চলে একটা মজার কাহিনী চালু আছে। দু'জনের কেউ-ই নিজের দাবী প্রমাণ করতে না পেরে, ঠিক করল, সেদিন স্থানীয় মন্দিরে মানত করে যে ফলকটা টাঙানো হ'বে তা দেখতে যাবে। দু'জনেই লুকিয়ে লুকিয়ে শিল্পীর কাছে গেছল, ফলকটাতে কি লেখা থাকবে তা জানতে। দু'জনেই

কিন্তু একটু ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কথা শুনেছিল এবং যে লোকটা শুধু বড় হরফগুলো চিনত সে হার না স্বীকার করে অন্য লোকটিকে মিথ্যাবাদী বলে গালি দিল। অন্য লোকটি আবার শুধু ছোট হরফগুলো চিনত। এবারো তারা স্ব স্ব দাবী প্রমাণ করতে না পেরে একজন পথিকের শরণাপন্ন হ'ল। পথিক কিন্তু একবার তাকিয়েই তাদের বলল: "ওখানে তো কিছুই নেই। ফলকটা এখনো অবধি টাঙানো হয়নি।"

আমার মনে হয় সাহিত্য সমালোচক হিসাবে বিবাদ করার আগে ফলকটা আমাদের টাঙিয়ে নেওয়া উচিত। কারণ, একমাত্র বিবদমান দুপক্ষই কেবল জানে যে তারা শূন্যে আস্ফালন করছে।

আমাদের নতুন সাহিত্য সম্বন্ধে ক'টি কথা

[১৯২৯ সালের ২২শে মে ইয়েনচিঙ বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা সাহিত্য সংঘে প্রদত্ত একটি বক্তৃতা।]

এক বছরের ওপর হবে তরুণ তরুণীদের কাছে আমি প্রায় কিছু বলিনি বললেই হয়। কারণ বিপ্লব শুরু হবার পর থেকে কথা বলার সুযোগ মিলেছে খুবই কম। হয় আপনি উত্তেজনা সৃষ্টিকারী, নয়তো প্রতিক্রিয়াশীল। বলাই বাহুল্য এই দু'ই বিশেষণের কোনটাই সুবিধাজনক নয়। সে যাই হোক এবার পিকিঙে আসার পর কয়েকজন পুরানো বন্ধু আমাকে এখানে আসতে বলেন ও সেই সঙ্গে দু'চার কথা বলতে। তাঁদের কথা ঠেলতে না পেরে হাজির হয়েছি কিন্তু এটা-সেটা নানা কারণে ঠিকই করতে পারিনি কি বলব—এমন কি, কি বিষয়ে বলব তাও না।

ঠিক করেছিলাম বাসে করে এখানে আসার পথে বিষয়টা স্থির করে ফেলব। কিন্তু রাস্তা এত খারাপ যে বাসটা ক্রমাগত মাটি থেকে এক ফুট করে লাফ মারছিল। মনঃসংযোগ করে কার সাধ্য! ঠিক এই সময়েই কথাটা মাথায় খেলল যে, যেন-তেন ভাবে বিদেশী কোনো জিনিস চালু করাটা অর্থহীন। আপনার যদি বাস থাকে তাহলে তার জন্য ভালো রাস্তা থাকাটাও প্রয়োজন। সবকিছুই পারিপার্শ্বিক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'তে বাধ্য, এবং একথা সাহিত্যের

বেলায়ও খাটে—খাটে, চীনে যাকে নতুন সাহিত্য বা বিপ্লবী সাহিত্য বলা হয় তার বেলায়ও।

আমরা যত বড় দেশপ্রেমী হই না কেন একথা বোধ হয় স্বীকার করতেই হ'বে যে আমাদের সভ্যতা খানিকটা পশ্চাদবর্তী। যা কিছু নতুন তা সবই বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে আমরাও অনেকেই নব নব শক্তির পরিচয় লাভ করে হয়েছি হতবুদ্ধি। পিকিঙের হাল এখনো এমন হয়নি তবে শাংহাইয়ের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ঐই শহরটির কেন্দ্রে বিদেশীদের বাস আর তার চারধারে দোভাষী, ডিটেকটিভ, পুলিশ, "বয়" ও এবংবিধ আরো অনেকের বেষ্টনী। এরা বিদেশীদের ভাষা বোঝে এবং বৈদেশিক সুযোগ-সুবিধা লাভের আইন কানুন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। এই বেষ্টনীর বাইরে সাধারণ মানুষের বাস।

সাধারণ মানুষ যখন বিদেশীদের সংস্পর্শে আসে তখন তারা কখনোই ঠিক মত জানতে পারে না যে কি ঘটেছে। একজন বিদেশী যদি বলে, "হ্যাঁ", তার দোভাষী বলে, "উনি আমাকে তোমার কান মলতে বলেছেন"। বিদেশী যদি বলে, "না", তার অনুবাদ হয়, "লোকটাকে গুলি করে মারো"। এই ধরনের অর্থহীন ঝামেলা এড়াতে হ'লে আরো জ্ঞানের প্রয়োজন, একমাত্র তখনই এই ব্যূহ ভেদ করা সম্ভব হবে।

সাহিত্য জগতেরও একই হাল। আমরা জানি খুব সামান্য এবং জানার কাজে সাহায্য করার মত উপকরণ খুব কমই আছে। লিয়াঙ শি-চিউ তাঁর 'ব্যাবিট'কে নিয়ে রয়েছেন, শু চি-মো রয়েছেন তাঁর 'টেগোর'কে নিয়ে, হু শি-র রয়েছে 'ডিউয়ি'। ও হ্যাঁ, শু চি-মো'র 'ক্যাথেরিন ম্যান্সফিল্ড'-ও আছেন, তাই তো এই বিদেশিনীর কবরের পাশে বসে তিনি অশ্রুমোচন করেছিলেন। 'ক্রিয়াশন স্কুলে'র রয়েছে বিপ্লবী সাহিত্য—বর্তমানে যে সাহিত্যে-র প্রচলন। এদের তরফে থেকে অনেক লেখাই বেরোচ্ছে, কিন্তু পড়াশোনা খুব একটা কিছু করা হচ্ছেনা। এখনো পর্যন্ত এমন কতকগুলো বিষয় রয়ে গেছে যা মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোকের ব্যক্তিগত সংরক্ষণে। একমাত্র এরাই এ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন তোলে।

সব সাহিত্যই তার পারিপার্শ্বিকের ছাঁচে তৈরী। শিল্প অনুরাগীরা যদিও দাবী করতে ভালবাসেন যে সাহিত্য বিশ্বপরিস্থিতিকে প্রভাবিত করতে পারে, সত্যটা কিন্তু এই যে রাজনীতির স্থান আগে এবং শিল্পে-র পরিবর্তন ঘটে সেই

অনুসারেই। কেউ যদি মনে করে যে শিল্প তার পরিবেশকে পাল্টে দিতে পারে, সে নেহাৎ ভাববাদীর মত কথা বলছে। সাহিত্যিকরা যা আশা করেন বাস্তব ঘটনাগুলো তার সঙ্গে কচিৎ-কখনো মেলে। আর এই জন্যেই বিপ্লবের আগে তথাকথিত বিপ্লবী সাহিত্যিকদের দুরবস্থা নিশ্চিত। একমাত্র বিপ্লব যখন ফলপ্রসূ হতে শুরু করে এবং মানুষ বুক ভরে শ্বাস নেবার সময় পায়, তখন-ই কেবল নতুন বিপ্লবী সাহিত্যিকদের দেখা পাওয়া যায়। এর কারণ একটা পুরোনো সমাজ যখন ধ্বংসের মুখে সে সময় অনেক লেখাই বেশ বৈপ্লবিক বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে তা সত্যিকার বিপ্লবী সাহিত্য নয়। যেমন ধরুন, একজন মানুষ পুরোনো সমাজটাকে ঘৃণার চোখে দেখতে পারে কিন্তু তার হয়তো কেবল ঘৃণাই আছে—ভবিষ্যতের কোনো চিত্র সামনে নেই। সামাজিক সংস্কারের জন্য সে হয়তো সোরগোল করছে, কিন্তু কি ধরনের সমাজ তার কাম্য জিজ্ঞেস করে দেখুন, দেখবেন হয়তো বাস্তবে রূপায়ণ অসম্ভব এমনই এক কাল্পনিক রাজ্যের কথা পেড়ে বসেছে। এমনও হতে পারে যে ওর আর বাঁচার ইচ্ছে নেই বলেই একটা বিরাট কোন পরিবর্তন দেখতে চাইছে নিজের অনুভূতিগুলোকে জাগিয়ে তুলতে। মদ আর খাবার গিলে যাদের পেট ভর্তি তাদের কেউ কেউ যেমন গরম লঙ্কা খায় সন্তুষ্টি পেতে। এই সঙ্গে সেই সব প্রবীণ সৈনিকদেরও নাম করতে হবে যারা জনসাধারণের কাছে পদাঘাত খেয়েও নতুন করে সাইনবোর্ড টাঙায়। যারা নিজেদের পদমর্যাদা বৃদ্ধির আশায় কোন কোন নতুন শক্তির ওপর ভরসা করে।

চীনে এমনও দেখা গেছে যে, এককালে যাঁরা বিপ্লবের জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করেছিলেন সেই সব লেখকও বিপ্লব সমাধা হবার পর নীরব হয়ে গেছেন। চিঙ রাজত্বের শেষবর্তী কালের 'সাউথ ক্লাব'-এর সদস্যরা এরই উদাহরণ। এই সাহিত্যিক গোষ্ঠীটি বিপ্লবের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, হানদের দুঃখ-দুর্দশায় হয়েছিল শোকবিহ্বল, মাঞ্চুদের স্বৈরাচারে ক্ষুব্ধ এবং তাদের "পুরোনো সুখের দিনে" প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা হয়ে উঠেছিল তীব্র। কিন্তু রিপাবলিকের পত্তন হবার পর এরা একেবারেই নীরব হয়ে গেল। আমার তো ধারণা এর কারণ এদের স্বপ্ন ছিল বিপ্লবের পর "প্রাচীনকালের গৌরবসমূহের পুনরুজ্জীবন" দেখতে পাবে—পুরোনো দিনের সরকারী কর্মচারীদের সেই উঁচু টুপি আর চওড়া

কোমরবন্ধ। কিন্তু তা যখন হল না এবং বাস্তব তাদের কাছে বিস্বাদ ঠেকল, লেখবার কোন তাগিদই এরা আর অনুভব করল না। আরো স্পষ্ট উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় রাশিয়ায়। অক্টোবর বিপ্লবের শুরুতে অনেক বিপ্লবী লেখকই অতি উৎফুল্ল হয়ে এই সামুদ্রিক তুফানকে স্বাগত জানান এবং উদগ্রীব হয়ে ওঠেন এই ঝড়ের মধ্যে নিজেদের যাচাই করে নিতে। কবি ইয়েসেনিন ও ঔপন্যাসিক সোপেলি কিন্তু পরবর্তীকালে আত্মহত্যা করেন। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে বিখ্যাত লেখক এরেনবুর্গ নাকি দিন দিন প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছেন। এর কারণ কি? কারণ, তাদের ওপর দিয়ে যা যাচ্ছে তা সামুদ্রিক তুফান নয়, তাঁদের যা যাচাই করছে তা ঝড় নয়—এ হল যাকে বলে সাচ্চা মৃত্তিকাশ্রয়ী বিপ্লব। স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেছে বলেই এদের আর বুঝি জীবনধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না! ওদের কাজটা কিন্তু সেই পুরোনো বিশ্বাসের মতো, অর্থাৎ—মৃত্যুর পর আত্মার স্বর্গারোহণ এবং ভগবানের পাশে বসে কেক ভক্ষণের* মত ভাল নয়। নিজেদের আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ না দেখেই মরাটাকে কি ভাল বলা চলে?

চীনে অবশ্য, ওরা বলছে, ইতিমধ্যেই একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। রাজনীতির জগতে কথাটা সত্যি হতে পারে, শিল্প জগতে নয়। কেউ কেউ বলছে, "পেটি বুর্জোয়াদের সাহিত্য এখন মাথা চাড়া দিচ্ছে।" সত্যি বলতে কি, এ ধরনের আদৌ কোন সাহিত্য-ই নেই। কাজেই যার মাথাই নেই সে আবার মাথা চাড়া দেবে কোত্থেকে! ইতিপূর্বে যা বলেছি তাই দিয়ে বিচার করলে—বিপ্লবীরা যতই তা অপছন্দ করুক না—সাহিত্যে কোন পরিবর্তন বা নবজাগরণ আসেনি। কি বিপ্লব কি অগ্রগতি, সাহিত্য কোনটিকেই প্রতিফলিত করেনি।

আর ক্রিয়েশান সোসাইটি যে আরো প্রগতিবাদী বিপ্লবী সাহিত্যের পক্ষে প্রচার চালাচ্ছেন, অর্থাৎ প্রলেতারীয় সাহিত্যের পক্ষে—সে শুধু ফাঁকা বুলি। ওয়াঙ তু-চিঙ'এর যে কবিতাটি এখানে, ওখানে, সর্ব-খানেই নিষিদ্ধ করা

* হাইনে রচিত "ডি হাইমকেয়ার" (বাড়ি ফেরার পথে)-এর অন্তর্ভুক্ত "মিয়ার ট্রয়েম্ট: ইহক্ বিন্ ডেয়ার লিবে গট্" (স্বপ্ন দেখলাম, আমিই স্বয়ং ঈশ্বর) কবিতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করা হয়েছে।

হয়েছে সেটি লেখা হয়েছিল শাংহাইয়ের আন্তর্জাতিক আবাসাঞ্চলে বসেই। লেখক তখন বিপ্লবী ক্যাপ্টেনের দিকে একবার চোখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিলেন। কিন্তু যত বড় সম্ভব ছাপার হরফে তাঁর এই—

পঙ, পঙ, পঙ,

শুধু এই কথাই জানিয়ে দিচ্ছে যে তাঁর ওপর শাংহাইয়ের সিনেমাগুলোর পোস্টার আর 'সোয়া সনের' বিজ্ঞাপন কতটা দাগ কেটেছে। উনি ব্লকের 'বারো' নামক কবিতার অনুকরণ করেছেন, কিন্তু ব্লকের সে ক্ষমতা ও ধী-শক্তি তাঁর নেই। অনেকেই কুয়ো মো-জো'র 'হাত' লেখাটিকে চমৎকার সৃষ্টি বলে পড়তে বলেন। এখানে বিপ্লবের পর একজন বিপ্লবীর একটি হাত খোয়ানোর কথা বলা হয়েছে—এর পরেও কিন্তু অপর হাতটির সাহায্যে প্রেয়সীর হাত ধরতে তিনি সক্ষম। সত্যি, ক্ষতি যদি হয়-ই এমনি হওয়াই ভাল। আপনাকে যদি চার হাত পায়ের মধ্যে কোন একটাকে হারাতেই হয়, সেক্ষেত্রে একটা হাত যেতে দেওয়াই উচিত। একটা পা হারানো অসুবিধাজনক, আর মাথা হলে তো কথাই নেই। তাছাড়া কেউ যদি একটা হাত ছাড়া আর কিছু হারাতে হবে না বলে মনে করে থাকে তাহলে তীব্র সংঘর্ষে অংশ গ্রহণ করতে তার খুব বেশি সাহসের প্রয়োজন হওয়া উচিত নয়। আমার কিন্তু তবু মনে হচ্ছে, একজন বিপ্লবীকে এর চেয়েও অনেক বড় ত্যাগের জন্য তৈরী থাকতে হবে। 'হাত' কবিতাটি সেই সংগ্রামী দরিদ্র শিক্ষার্থীকে নিয়ে চালু বহু পুরোনো গল্পটার মতো! এই গল্পে গরীব ছেলেটি শেষ পর্যন্ত সেই রাজপ্রাসাদের পরীক্ষায় কৃতকার্য হয় এবং একটি সুন্দরী তনয়াকে বিবাহ করার পর সব কিছুর ইতি টানে।

আসলে কিন্তু চীনের সাম্প্রতিক অবস্থার এ কথাটা প্রতিফলন। সম্প্রতি শাংহাইয়ে প্রকাশিত এক বিপ্লবী সাহিত্য-কর্মের প্রচ্ছদে একটি ত্রিশূলের ছবি রয়েছে ('যন্ত্রণার প্রতীক'*-এর প্রচ্ছদ থেকে গৃহীত), আর তার মাঝের ফলাটায় সাঁটা রয়েছে সোভিয়েতের পতাকা থেকে গৃহীত হাতুড়িটি। এই সন্নিবেশের অর্থ: না আপনি ত্রিশূলখানা নিক্ষেপ করতে পারবেন, না

---

* হাকুসন কুরিয়াগাওয়া লিখিত সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক একটি বই-জাপানী ভাষা থেকে লু শুন কর্তৃক অনূদিত।

হাতুড়িখানা দিয়ে আঘাত করতে। ছবিটাতে শিল্পীর খোকামীই কেবল স্পষ্ট। এই সব লেখকদের বাস্তুবন্ধ হিসাবে এটা অবশ্য ঠিকই মানাবে।

অবশ্যই এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে যাওয়া সম্ভব। তবে সব চেয়ে ভাল হচ্ছে নিজের বক্তব্য খোলাখুলি ভাবে বলে ফেলা, লোকে যাতে বুঝতে পারে আপনি বন্ধু কি শত্রু। কারুর মাথা যদি পুরোনো পাঁকে ভর্তিই থাকে তখন সে তথ্য গোপন করতে নিজের নাকের দিকে নাটকীয় ভঙ্গীতে অঙ্গুলি নির্দেশ করে একথা ঘোষণা করতে যাওয়া উচিত নয় যে: "আমিই একমাত্র সাচ্চা সর্বহারা।" একালের লোকে এত বেশী অনুভূতিশীল যে "রাশিয়া", এই শব্দটি কানে এলেও তাদের গায়ে জ্বর আসে এবং শীঘ্রই তারা আর ঠোঁট অবধি লাল রঙা হতে দেবে না। এরা যে কোনো প্রকার প্রকাশনের ভয়ে সন্ত্রস্ত। ওদিকে আমাদের বিপ্লবী লেখকরা আবার আরো তত্ত্ব বা বিদেশী বইয়ের সঙ্গে পরিচিতি ঘটানোর কাজে অনিচ্ছুক—স্রেফ নাটকীয় ভঙ্গিতে আঙুল উঁচিয়ে বসে থাকে নিজেদের দিকে। এরা শেষ পর্যন্ত প্রাক্তন চিঙ রাজত্বের সময়কার "রাজকীয় আদেশানুসারে ভৎর্সনা" গোছের এমন একটা কিছু আমাদের জন্যে লেখে যার বক্তব্যের বিন্দু-বিসর্গ কারুর বোধগম্য হয় না।

"রাজকীয় আদেশানুসারে ভৎর্সনা" ব্যাপারটা আমাকে বোধ হয় বুঝিয়ে বলতে হবে। এ সেই সম্রাটদের আমলের কথা। একজন সরকারী কর্মচারী তখন কাজে কোন ভুল করলে তাঁকে আদেশ দেওয়া হ'ত ফটক বা ঐ জাতীয় একটা কিছুর বাইরে হাঁটু গেড়ে বসতে। ইতিমধ্যে সম্রাট একজন খোজাকে পাঠিয়ে দিতেন উত্তম-মধ্যম দেবার জন্য। খোজার হাতে কিছু গুঁজে দিলে খুব শীঘ্রই সে শান্ত হ'ত। কিন্তু কিছু না দিলে সে এমন গালি দিতে আরম্ভ করত—প্রাচীনতম পূর্ব পুরুষ থেকে শুরু করে বংশধররা পর্যন্ত পরিবারের কেউ বাদ পড়ত না। সবাই মনে করতো এটা সম্রাটেরই কণ্ঠস্বর। কিন্তু এমন কে আছে যে সম্রাটের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে যে সত্যিই তাঁর এসব কথা বলার অভিপ্রায় ছিল কিনা? গত বছর একটি জাপানী পত্রিকা ঘোষণা করেছিল যে চেঙ ফাঙ-উ'কে জার্মানী গিয়ে নাট্য-কলা অধ্যয়নের জন্য চীনের কৃষক ও শ্রমিকেরাই নির্বাচিত করেছিল। কিন্তু যথাপূর্বং সত্যিই উনি এই ভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন কি না, তা জানবার কোন উপায় নেই।

এই জন্যেই আমি অনেক দিন থেকেই বলছি যে, আমরা যদি নিজেদের বোধশক্তি বাড়াতে চাই তাহলে অবশ্যই আরো বেশি বিদেশী বই পড়তে হবে। আমাদের চার পাশের বেষ্টনীটা ভেঙে তবেই বেরিয়ে পড়া যাবে। কাজটা আপনাদের পক্ষে তেমন কিছু কষ্টসাধ্য নয়। যদিও নতুন সাহিত্যের ওপর খুব বেশি ইংরাজী বই বা ইংরাজী অনুবাদ নেই, যে ক'টা রয়েছে তার ওপর মোটামুটি ভরসা রাখা চলে। বিদেশী তত্ত্ব বা সাহিত্য আরো বেশি ক'রে পড়লে দেখবেন আমাদের নতুন চীনা সাহিত্য বিচার করতে বসে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছেন। আরো ভালো হয় যদি এই ধরনের লেখা চীনে প্রচলিত করতে পারেন। নোংরা কিছু লেখার চাইতে অনুবাদ করাটা কিছুমাত্র সহজ কাজ নয়, কিন্তু আমাদের নতুন সাহিত্যের বিকাশ লাভের পক্ষে তা অনেক বেশি সহায় হবে। অনেক বেশি কাজে লাগবে আমাদের দেশের লোকেদের।

সাহিত্যের শ্রেণী-চরিত্র

['কঠিন অনুবাদ' ও 'সাহিত্যের শ্রেণী-চরিত্র' নামক প্রবন্ধটির শুধু সেই অংশের বাঙলা অনুবাদ যার মধ্যে 'সাহিত্যের শ্রেণী-চরিত্র' সংক্রান্ত আলোচনা সীমাবদ্ধ।]

'সাহিত্যের কি শ্রেণী-চরিত্র আছে?'—এই মহান প্রবন্ধটির কথাই ধরা যাক, যা শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে সাহিত্যের তেমন কিছু নেই। আমার মনে হয় শ্রেণী-চরিত্র মুছে ফেলার কাজে শ্রেষ্ঠ দু'টি প্রচেষ্টা হল—মাননীয় উ চি-হুই'এর বিদগ্ধ রচনা 'মার্ক্স ও পার্ক্স' এবং ঐ অন্য ভদ্রলোকটির* 'শ্রেণী বলে কিস্সু নেই'। এদের মতে কুদে পাখিগুলো'

* প্রতিক্রিয়াশীল লেখক লিয়াঙ শি চিউ, যার স্বরূপ এই প্রবন্ধটির মধ্য দিয়েই ফুটে উঠেছে।

তাদের কিচির-মিচির বন্ধ করলেই জগতে শান্তি আসবে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে মাননীয় মিঃ লিয়াঙ আবার 'এই মার্ক্সবাদ' দ্বারাই বিবিক্ত। তাই উনি স্বীকার না করে পারেননি যে পুঁজিবাদী নামক একটা ব্যবস্থা কয়েক জায়গায় আছে এবং এ ব্যবস্থা যেখানে যেখানে আছে সর্বহারাদেরও সেখানে দেখা মেলে। সে যাই হোক্ "সর্বহারাদের কিন্তু গোড়ার দিকে শ্রেণী সচেতনতা ছিল না। গুটিকয়েক ভারী দয়ালু ও প্রগতিশীল ভাবধারাবাহী নেতা তাদের শ্রেণী হিসাবে সচেতন হবার শিক্ষা দেন," যাতে তারা আরো শীঘ্র দলবদ্ধ হয় এবং তাদের যোদ্ধ মনোভাব জেগে ওঠে। কথাটা ঠিক, তবে আমার ধারণা তাদের শিক্ষকরা অতি-করুণা বশতঃ একাজে উদ্যোগী হননি, হয়েছিলেন জগতটাকে পাল্টাবার ইচ্ছাতেই। তা ছাড়া "যে জিনিসটির অস্তিত্বই নেই" তার নিশ্চয় সচেতনতা থাকতে পারে না বা তাকে জাগরিত করা যায় না। আর সত্যিই যদি তা সম্ভব হয় তো বুঝতে হ'বে আসলে এটির অস্তিত্ব আছে। যার অস্তিত্ব আছে তাকে কিন্তু বেশি দিন লুকিয়ে রাখা যায় না। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে গ্যালিলিও ও তাঁর দাবী পৃথিবী ঘুরপাক খায় এবং ডারউইন ও তাঁর বিবর্তনের তত্ত্ব প্রথম দিকে ধর্মবিশ্বাসীদের হাতে প্রায় পুড়তে বসেছিল, রক্ষণশীলদের প্রচণ্ড আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিল। তবু আজ আর কেউ তাঁদের শিক্ষণের মধ্যে আশ্চর্য কিছু দেখেন না। দেখেন না কারণ, পৃথিবী সত্যিই ঘুরপাক খায় এবং জীবন্ত প্রাণীদেরও বিবর্তন হচ্ছে। একটা জিনিসের অস্তিত্ব আছে স্বীকার করেও পরে আবার তা লুকিয়ে ফেলতে অসাধারণ দক্ষতার প্রয়োজন।

মিঃ লিয়াঙ নিজে কিন্তু যে কোন সংঘর্ষের চির-অবসান ঘটাবার একটা কায়দা জানেন, কারণ রুশোর মত তিনিও বিশ্বাস করেন, "সভ্যতার ভিত্তি সম্পত্তি। কাজেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আক্রমণ করা মানে সভ্যতাকেই আক্রমণ করা। সামান্য কিছু ঋণ থাকা সত্ত্বেও কোন শ্রমিক যদি জীবন ভোর ভাল ভাবে খাটে, তাহলে ভদ্রগোছের একটা সম্পত্তি তার করায়ত্ত না হয়ে যায় না। এই হচ্ছে জীবনে সংগ্রাম করার প্রকৃষ্ট উপায়।" আমার ধারণায় রুশো একশো পঞ্চাশ বছর আগের মানুষ বটে কিন্তু তাঁর পক্ষেও বোধ হয় একথা ভাবা দুষ্কর হ'ত যে বর্তমান ও অতীতের তাবৎ সংস্কৃতির ভিত্তি সম্পত্তি (তিনি যদি বলতেন অর্থনৈতিক সম্পর্কই এর ভিত্তি, তাহলে কিন্তু কোনো প্রশ্নই উঠত না।) গ্রীস ও

ভারত এককালে সুমহান সভ্যতার অধিকারী ছিল কিন্তু তাদের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগগুলি যে বুর্জোয়া সমাজের অন্তর্গত ছিল না, একথা লেখকের জানা উচিৎ। আর তা যদি নাই-ই জানেন, সে ত্রুটি তাঁর নিজের। এখন যদি কেউ সেই সঠিক পথের কথা তোলেন যে পথ দিয়ে সর্বহারাদের বিত্তবান শ্রেণীতে পৌঁছবার চেষ্টা করা উচিত, তাহলে বলতে হয় মন-মেজাজ খুশ্ থাকলে চীনের ধনবান ও বৃদ্ধ ভদ্রলোকরা দরিদ্র শ্রমিকদের এই শিক্ষাই দেয়। সত্যিই, শ্রমিকদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে "কঠোর ও আন্তরিক" শ্রমের ওপর ভরসা করে সামাজিক মই-টার এক ধাপ ওপরে উঠতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু এ তো "নিজ শ্রেণী সম্বন্ধে সচেতন হও" শিক্ষা পাবার আগের কথা। একবার এ শিক্ষা পেলে তাঁরা আর ধাপে ধাপে ওপরে উঠেই সন্তুষ্ট হবেন না। কথাটা ঠিকই বলেছেন মিঃ লিয়াঙ: "শ্রেণী হিসাবে শ্রমিকরা সংগঠিত হতে চায়। সংগঠিত হবার পর তারা আর গতানুগতিক পথ অনুসরণ করবে না। ঝাঁপিয়ে পড়তে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে, শাসক শ্রেণীতে পরিণত হ'তে।" কিন্তু এমন শ্রমিক কি একজনও আছেন যিনি চান "কঠোর ও আন্তরিক ভাবে জীবন ভোর খাটতে, যতক্ষণ না ভদ্রগোছের একটা সম্পত্তি আহরণ করতে পারছেন? তবে হ্যাঁ, যাঁরা "অদ্যাপি বিত্তবান ন'ন ও সম্পত্তির মালিক হননি"—তাঁদের এই গোত্রভুক্ত হওয়াই উচিৎ। মিঃ লিয়াঙের উপদেশ খাটিয়ে-মানুষরা এত প্রবল বিক্রমে বরবাদ করে দেবেন যে বুড়ো বুড়ো ভদ্রলোকদের সঙ্গে সৌজন্য জ্ঞাপক সংলাপ বিনিময় করা ছাড়া তাঁর আর করার কিছু থাকবে না।

ভবিষ্যতের বুকে তাহলে কি জমা হয়ে রয়েছে? মিঃ লিয়াঙ আতঙ্কিত হবার কোন কারণ দেখতে পাচ্ছেন না। কেননা এই ধরনের বৈপ্লবিক কাল কখনো স্থায়ী হয় না। তাছাড়া বিবর্তনের একটা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই নাকি 'যোগ্যতমের টিকে থাকা' নামক তত্ত্বটি পুনঃ প্রমাণিত হবে এবং তখন দেখা যাবে সবচেয়ে যারা পটু ও বুদ্ধিমান তারাই শ্রেষ্ঠ স্থানগুলো দখল করে নিয়েছে, আর শ্রমিকরা সেই শ্রমিকই রয়ে গেছে। কিন্তু ওদিকে সর্বহারারাও নিঃসন্দেহে বুঝে ফেলেছেন যে "বর্বর যত শক্তি তা আজ হোক কাল হোক সভ্যতার শক্তির কাছে পরাস্ত হবেই' এবং তাঁরা নিজেরাই "গড়ে তুলবেন তথাকথিত একটি প্রলেতারীয় সংস্কৃতি…যার মধ্যে শিল্প এবং বিজ্ঞান এই দুই থাকবে।"

এবার আসা যাক্ আমাদের প্রধান বিষয়টিতে—সাহিত্য সমালোচনার কথায়।

মিঃ লিয়াঙ প্রথমেই বলেছেন যে প্রলেতারীয় সাহিত্যতত্ত্বের প্রধান ত্রুটি "সাহিত্যকে শ্রেণী শৃঙ্খলে আটকে ফেলা", কারণ একজন পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে যেমন পার্থক্য আছে তেমনি কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্যও আছে। তাঁদের "মানব প্রকৃতি" (কথা দু'টোর পাশে বৃত্ত আঁকা রয়েছে) "কিন্তু এক"। যেমন—দু'জনেই আনন্দ ও ক্রোধের সঙ্গে পরিচিত, পরিচিত প্রেমের সঙ্গেও ("প্রেমের প্রকাশভঙ্গি নয়, 'প্রেম' নামক বস্তুটির কথা"ই এখানে বলা হচ্ছে)। "সাহিত্য এমন-ই একটি শিল্প যা সর্বাপেক্ষা মৌলিক এই মানব প্রকৃতিটিকে প্রকাশ করে।" এইসব মন্তব্য পরস্পর-বিরোধী ও অর্থহীন। সম্পত্তি যদি সংস্কৃতির ভিত্তি হয় এবং দরিদ্রদের মধ্যে "যোগ্যতমরা" যদি জীবনে উন্নতি করতে আপন আপন সামর্থ্যটুকু পুরো নিয়োজিত করে খাটে তাহলে মানব জীবনের মূল লক্ষ্য নিশ্চয় সামাজিক সোপান আরোহণ আর ধনীরাই মানব জাতির চরম গৌরব। সে 'ক্ষেত্রে, সাহিত্যের পক্ষে কেবল বুর্জোয়াদের চিত্রাঙ্কণ-ই তো যথেষ্ট—এই "সমব্যথিত্ব-র আতিশয্য" কেন? শ্রমিক শ্রেণীর অবলুপ্তি যখন অবশ্যম্ভাবী, শ্রমিকদের আবার টেনে আনা কেন? সে যাই হোক, আপনি-ই এবার বলুন আপনা হতে "মানব প্রকৃতি" কি ভাবে চিত্রিত করবেন? কি মৌলিক কি যৌগিক সব রাসায়নিক পদার্থেরই নিজস্ব রাসায়নিক আসক্তি আছে। সব ভৌত পদার্থেরই আছে বিশেষ মাত্রার কঠিনতা। কিন্তু এই সব গুণাগুণ যখন আপনি ব্যক্ত করতে চাইবেন, তখন কমপক্ষে দু'টি পদার্থকে অন্তত ব্যবহার করতে হবেই। রাসায়নিক আসক্তি বা কঠিনতার মাত্রা "আপনা হ'তে" ব্যক্ত করার কোন ঐন্দ্রজালিক উপায় নেই—কোন না কোন পদার্থের আশ্রয় আপনাকে নিতেই হবে। তেমনি সাহিত্যও মানবচরিত্র ব্যতিরেকে মানুষের "প্রকৃতি" উন্মোচিত করতে পারে না। কিন্তু একবার যেই মানব চরিত্রদের এনে ফেলা হ'ল বিশেষ করে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে, আর তাদের সহজাত শ্রেণী-চরিত্রকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। এটা জোর করে শ্রেণী "শৃঙ্খল" আরোপ করার প্রশ্ন নয়—এটা অবশ্যম্ভাবী। মানব প্রকৃতি মাত্রেই আনন্দ ও ক্রোধের সঙ্গে

পরিচিত বটে কিন্তু তা বলে দরিদ্ররা ফাট্‌কা বাজারে টাকা হারিয়েছে বলে কখনো উদ্বিগ্ন হয় না এবং পিকিঙে আধপোড়া কয়লা সংগ্রহ করে বেড়ায় এমন একটি বুড়ীর দুর্দশার কথা একজন তৈলাঞ্চলপ্রভু কখনো জানতে পারে না। দুর্ভিক্ষের বলিয়া কচিৎ ধনী বৃদ্ধ ভদ্রলোকেদের মত অর্কিড পোঁতে, চিয়া পরিবারের চিয়াও তা কখনো কুমারী লিনের* প্রেমে পড়ে না। "ও বাপ্প, তুমি শীষ দাও! ও লেনিন!" যেমন কোনমতেই প্রলেতারীয় সাহিত্য নয়, তেমনি "সকল বস্তু! সকল মানব!" বা "আনন্দের দিনে সব মানুষই উৎফুল্ল"—একথা আপনা হতে "মানব প্রকৃতি"-র স্বরূপ জাহির করেছে বলে যে রচনাগুলো ঘোষণা করছে সেগুলোও প্রলেতারীয় সাহিত্য নয়। মানব প্রকৃতির নিকৃষ্টতম সাধারণ গুণনীয়ককে যে সাহিত্য চিত্রিত করে তাকে যদি আমরা সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করি, তাহলে খাওয়া, শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ, চলা-ফেরা, প্রজনন প্রভৃতি সবচেয়ে জান্তব ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা দেওয়াই নিশ্চয় আরো ভালো। আর তার চেয়েও ভালো গতিবিধির (movements) পাঠ তুলে দিয়ে শুধু জৈব প্রকৃতির (biological nature) বর্ণনা দেওয়া। যদি বলেন, আমরা মানুষ বলে মানবপ্রকৃতির বর্ণনা দেবই, শ্রমিকরাও তাহলে শ্রমিক বলেই প্রলেতারীয় সাহিত্য সৃষ্টি করবেই।

মিঃ লিয়াঙ এর পরে বলেছেন, লেখকের নিজ শ্রেণীর কোনো প্রভাব তাঁর লেখার মধ্যে পড়ে না। টলস্টয় ছিলেন অভিজাতদের একজন, তবু দরিদ্রদের প্রতি তাঁর সমবেদনা ছিল। অবশ্য শ্রেণীসংগ্রামের হয়ে তিনি কথা বলেননি। মার্ক্স নিশ্চয় সর্বহারাশ্রেণীভুক্ত ছিলেন না এবং ডক্টর জনসন, যিনি আজীবন দরিদ্রই রইলেন, এমন অভিজাত ভঙ্গিতে কথা বলতেন, হাব-ভাব এমন ছিল যে তা অভিজাতদেরও হার মানাত। তাই কোনো সাহিত্যকর্ম বিচারের সময় লেখকদের সামাজিক পদমর্যাদা এবং শ্রেণী নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে, লেখাটি আপনাকে পড়তে হবে।

সাহিত্যের কোনো শ্রেণীচরিত্র নেই প্রমাণ করতে এইসব উদাহরণ কিন্তু একেবারেই অক্ষম। টলস্টয় ছিলেন অভিজাতদের একজন, যিনি তাঁর সহজাত সব পুরোনো প্রবৃত্তিগুলোর হাত থেকে পুরোপুরি অব্যাহতি পাননি। আর ঠিক এই কারণেই দরিদ্রদের জন্য তিনি শুধু সমবেদনাই পোষণ

*'লাল কুঠরীর স্বপ্ন'র নায়িকা। চিয়াও তা একজন ভৃত্য।

করেছেন, শ্রেণী সংগ্রামের আহ্বান জানাননি।' মার্ক্স শ্রমিকশ্রেণী থেকে আসেননি ঠিকই কিন্তু তিনি যেহেতু কোনো সাহিত্যকর্ম রচনা করেননি তাই একথা ধরে নেওয়া ঠিক হবে না যে, তা যদি তিনি করতেন তাহলে কেবল 'প্রেম' নামক বস্তুটিরই বিবরণ দিতেন, প্রেমের প্রকাশভঙ্গির নয়। আর ডক্টর জনসন, যিনি আজীবন দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়েও শোণিত সূত্রে যে রাজা তার চেয়েও রাজকীয় ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলতেন, আচরণ করতেন—এ ব্যবহারের ব্যাখ্যা করতে পারছি না, কারণ ইংরাজী সাহিত্য ও ভদ্রলোকটির জীবন সম্বন্ধে খুব অল্পই জানি। হয়ত তিনি চেয়েছিলেন, সারা জীবন কঠিন এবং আন্তরিক ভাবে খেটে যাবেন, তারপর একটা ভদ্র গোছের সম্পত্তি করায়ত্ত হলে অভিজাত কুলে আরোহণ করবেন। কিন্তু অমোঘ বিধানের ফলে বিস্মৃতির গহ্বরে তলিয়ে যাওয়াই তাঁর স্থির হয়েছিল, সম্পত্তিটুকু পর্যন্ত আহরণ করতে পারেন নি। নিজের "আনন্দের" জন্য তাঁর শুধু ভান করাই সার হয়েছে।

এরপর মিঃ লিয়াঙ বলেছেন, "মহৎ কোনো রচনা সর্বদাই সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি। সংখ্যাগরিষ্ঠরা চিরকালই নির্বোধ, চিরকালই সাহিত্য পরাঙ্মুখ।" কিন্তু রুচি বা রুচির অভাবের সঙ্গে শ্রেণীর কোন সংশ্রব নেই কারণ, "সাহিত্য উপভোগ শক্তি সহজাত ক্ষমতা নির্ভর।" খাঁটি কথা: তাই সর্বহারাদের মধ্যেও এমন লোক থাকা সম্ভব, যাদের এই "ক্ষমতা" আছে। যতদূর দেখতে পাচ্ছি, এই ক্ষমতা বিশিষ্ট একজন লোক দারিদ্র্য হেতু স্কুলে না যেতে পারে, পুরোপুরি অক্ষর-জ্ঞান বর্জিত হতে পারে কিন্তু 'ক্রিসেণ্ট মুন মান্থলি' সে উপভোগ করবেই এবং তার থেকেই প্রমাণিত হবে "মানব প্রকৃতি"র ও শিল্পের এদিক দিয়ে শ্রেণী-চরিত্র বলে কিছু নেই। যাই হোক, মিঃ লিয়াঙ এ কথা জানেন যে এই সহজাত ক্ষমতা কিন্তু সর্বহারাদের মধ্যে খুব বেশি সংখ্যকের নেই। তাই তো তিনি এদের জন্যে বেছে নিয়েছেন অন্য কয়েকটি শিল্প (?): "জনপ্রিয় গীতিনাট্য, সিনেমা, জনপ্রিয় গল্প ও আরো কিছু কিছু"। বিশেষ করে এই ক'টিকে বাছার কারণ: "বেশির ভাগ শ্রমিক ও কৃষকই মজার কিছু দেখতে চায় আর মাঝে মাঝে একটু আধটু শিল্পাশ্রয়ী আমোদ প্রমোদ"। এদিক থেকে দেখলে অবশ্যই মনে করার সুযোগ আছে যে শ্রেণী বিভেদে সাহিত্যের যেন তারতম্য হচ্ছে। কিন্তু যার বিকাশে অর্থের কোন অবদান নেই,

যা এক "সহজাত ক্ষমতা"—মানুষের সেই রুচিই এই তারতম্য নির্ধারিত করে ব'লে মিঃ লিয়াঙ ঘোষণা করেছেন। লেখকদের তাই নির্বিদ্বিধায় লিখে যাওয়াই উচিত। তাঁরা যেমন অভিজাত বা রাজবংশীয় পৃষ্ঠপোষকদের প্রশংসা করে প্রবন্ধ লিখবেন না তেমনি ভয়ে শ্রমিক শ্রেণীর কাছে নিজেদের মাথা নত হতেও দেবেন না। খুব সত্যি। তবে প্রলেতারীয় সাহিত্য যে ক'টি আমরা দেখেছি তার কোনটাতেই একথা বলা হয়নি যে লেখকের অভিজাত ও রাজবংশীয়দের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করা উচিত বা শ্রমিক শ্রেণীর ভয়ে ভীত হওয়া উচিত যাতে এই দুই তরফের যে কোন একজনের প্রশংসা ধন্য হয়ে প্রবন্ধ লেখা যায়। এখানে শুধু এই কথাই দাবী করা হয়েছে যে, সাহিত্যের শ্রেণী-চরিত্র আছে এবং শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে লেখকরা নিজেদের যতই "স্বাধীন" ও শ্রেণী উর্ধ্বে বলে মনে করুন না, নিজ শ্রেণীর চিন্তাধারা অনুযায়ী তাঁরা অন্তত পক্ষে অচেতন ভাবে চালিত হতে বাধ্য। কাজেই তাঁরা যা লেখেন তা কোনমতেই অন্য কোন শ্রেণীর সংস্কৃতি হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে মানানসই বলে মিঃ লিয়াঙের নিবন্ধটির কথাই ধরা যাক্—সাহিত্যের শ্রেণী-চরিত্র লোপ করতে যা উন্মুখ এবং চতুষ্পার্শ্বে যা সত্যের অগ্নিবর্ষণ করছে। এক পলকেই বোঝা যায় যে এই ভাবে সম্পত্তিকে সংস্কৃতির ভিত্তিরূপে দেখা, আর আবর্জনা স্বরূপ দরিদ্রদের অবশ্যম্ভাবী বিলুপ্তির কথা ঘোষণা করা আসলে বুর্জোয়া "অস্ত্র"—মানে আর কি বলতে চাইছিলাম যে এইটাই বুর্জোয়া "যুক্তি"। প্রলেতারীয় সাহিত্য সমালোচকরা মনে করেন যে যারা বলে সাহিত্য "শ্রেণীর উর্ধ্বে" ও "সমগ্র মানবজাতি"-র জন্যে, তারা আসলে ধনিক শ্রেণীর দালাল। মিঃ লিয়াঙের লেখাতেও আমরা তারই স্পষ্ট প্রমাণ পাচ্ছি। মিঃ চেঙ ফাঙ-উ'র মতো লোকেরা আবার বলে: "প্রলেতারীয়দের জয় অনিবার্য, কাজেই চলো আমরা ওদের পথ দেখাতে, সান্ত্বনা দিতে যাই"। তারপরেই কিন্তু "ওহে—ছুট লাগাও" বলে "প্রলেতারীয়"দের এরা বিদায় করে দেয়। তার মানে নিজেরা ছাড়া আর যত প্রলেতারীয় লেখক আছে তাদের বিদায় করে দেয়। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, শ্রমিক শ্রেণীর সাহিত্য তত্ত্বকে নিজের মত করে বিকৃত করার ব্যাপারে ইনি মিঃ লিয়াঙের ভ্রান্ত ধারণারই শরিক।

এ ছাড়াও মার্ক্সবাদী সাহিত্য সমালোচকরা শিল্পকে যেভাবে সংগ্রামের

হাতিয়ার হিসাবে—প্রপাগ্যাণ্ডা হিসাবে ব্যবহার করেন, তা মিঃ লিয়াঙের অত্যন্ত ঘৃণ্য ঠেকেছে। "বহু দূর-ভবিষ্যতে কোন একটা উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কারুর লেখনীর আশ্রয় নেওয়ার মধ্যে আমার অসম্মতি নেই", কিন্তু "এই প্রপাগ্যাণ্ডাকে সাহিত্য বলে স্বীকার করা চলে না"। আমার মনে হচ্ছে উনি অকারণে চিন্তিত হচ্ছেন। মার্ক্সীয় তত্ত্ব যেটুকু পড়েছি তাই দিয়ে বিচার করেই বলছি যে শিল্প পক্ষপাতিত্ব করতে বাধ্য—এখানে শুধু এই কথাই ঘোষিত হয়েছে। প্রপাগ্যাণ্ডাই একমাত্র সাহিত্য বলে কেউ দাবী করেনি। একথা সত্যি যে গত কয়েক বছরের মধ্যে স্লোগান মিশ্রিত বহু কবিতা ও গল্পকেই প্রলেতারীয় সাহিত্য বলে চীনে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কি রূপ (form), কি বিষয়বস্তু কোন দিক দিয়েই এসব রচনায় শ্রমিক শ্রেণীত্ব বলে কিছু নেই বলেই "আধুনিকতা" জাহির করতে স্লোগানের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আসলে এগুলো প্রলেতারীয় সাহিত্যই নয়। এ বছর সেই প্রখ্যাত "প্রলেতারীয় সাহিত্য সমালোচক" মিঃ চিয়েন শিন-ৎস্থন "বিপ্লবী সাহিত্য"কে সমর্থন করতে 'দা পায়োনীয়ার' পত্রিকায় লুনাচার্স্কীর লেখা উদ্ধৃত করেছেন। আর তা করেছেন এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে স্বয়ং লুনাচার্স্কী যখন বৃহত্তর জনগণের বোধগম্য হয় এমন লেখার পক্ষাবলম্বন করেছিলেন তখন বোঝাই যাচ্ছে যে, স্লোগানে আর কারুর আপত্তি থাকা উচিত নয়। আমি কিন্তু মনে করি, সচেতন ভাবেই হোক কি অচেতন ভাবেই হোক্, উনি যে পরিমাণ সত্য বিকৃত করেছেন, মিঃ লিয়াঙ শি চিউ-ও ঠিক ততটাই করেছিলেন। লুনাচার্স্কী যখন বৃহত্তর জনসাধারণের বোধগম্য লেখার কথা বলেছিলেন তখন তিনি টলস্টয় যে ধরনের পুস্তিকা ছাপিয়ে নিজের কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন, যা এমন ভাষার গান ও রসিকতায় পূর্ণ ছিল যে শ্রমিক ও কৃষকরা সহজেই তা বুঝতে পারতেন—এর-ই কথা ভাবছিলেন। তাছাড়া ডেমিয়ান বায়েড্‌নি, যিনি তাঁর কবিতার জন্য রেড্ ফ্ল্যাগ ব্যাজ পেয়েছেন, তাঁর কবিতাতেও যে কোন স্লোগান নেই, এই ঘটনা থেকেও আমরা ঐ একই জিনিস দেখছি।

সবশেষে পণ্যগুলোকেই পরখ করে দেখতে চেয়েছেন মিঃ লিয়াঙ। সত্যি, এই হচ্ছে চরম বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি। তা বলে কিন্তু জনসাধারণের কাছে শুধুমাত্র দু'টি অনূদিত কবিতা পেশ করাটা ন্যায্য কাজ হয়নি।

'ক্রিসেন্ট মুন'-এ 'অনুবাদের সমস্যা' নামে একবার একটি নিবন্ধ ছাপা হয়েছিল, আর সে সমস্যা কবিতার বেলায় তো সবচেয়ে বেশি। নিজে যা পড়েছি তার বিচারে গত এগারো বছরে চীনে এমন কিছু রচনা প্রকাশিত হয়নি যার সঙ্গে লুনাচার্স্কীর 'ডন কুইক্সোটের মুক্তি', কাদায়েভের 'উনিশ' বা গ্লাডকভের 'সিমেন্ট'-এর তুলনা করা যায়। বুর্জোয়া সংস্কৃতির অস্তগামী ম্লান আলোতে গা ঢেকে যারা ভারী ঈর্ষান্বিত ভাবে নিজেদের লেখকদের বাঁচাচ্ছে সেই 'ক্রিসেন্ট মুন সোসাইটি' ও একই জাতের গোষ্ঠি-গুলোর কথা স্মরণ করেই আমার এই দাবী। আমি স্ব-ঘোষিত প্রলেতারীয় লেখকদেরও কোন সাফল্যমণ্ডিত রচনার উদাহরণ দিতে পারব না। মিঃ চিয়েন শিন-ৎসুন কিন্তু একজন ভালো কারণ-দর্শিয়ে। উনি বলেছেন যে, একটি উঠতি শ্রেণীর লেখার মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই ছেলেমানুষি ও সরলতা থাকে এবং শক্তপ্রাণ বুর্জোয়ারা ভিন্ন আর কেউ সোজাসুজি তাদের কাছ থেকে ভালো লেখা দাবী করে না। যে লোকটি বহুক্ষণ যাবৎ শীতে ও খিদেয় অবসন্ন, তার কাছে জানতে চাওয়া সে কেন লাখোপতির মতো মোটা নয়, এটা যেমন অযৌক্তিক আর বদ-দাবী, পূর্বোক্ত উক্তিটিও ঠিক তাই। তবে কিনা শুধু যদি শ্রমিক ও কৃষকদের লক্ষ্য করে কথাটা বলা হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্য ভুল কিছু বলা হয়নি! কিন্তু ক'ই, চীনের বর্তমান লেখকদের কেউ-ই তো এই মুহূর্তে কোদাল বা কুঠার নামিয়ে রাখেন নি! তাঁদের বৃহত্তর অংশই বুদ্ধিজীবী এবং কেউ কেউ বহুকাল যাবৎ খ্যাতনামা লেখক। এ কথা কি তাহলে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে তাঁরা যে মুহূর্তে তাঁদের পেটি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি জয় করেন, সাথে সাথে লেখবার পুরাতন দক্ষতাটুকুও অন্তর্হিত হয়? অসম্ভব! রাশিয়ার পুরানো লেখক আলেক্সি টলস্টয়, ভি ভেরেসায়েভ এবং প্রিশভিন এখনো ভালো লিখছেন। আমাদের চীনা লেখকদের তথ্যবর্জিত শ্লোগান ব্যবহার করার কু-অভ্যাসটি তাঁদের "শ্রেণী সংগ্রামে শিল্প হাতিয়ারের কাজ করে" এই দৃষ্টিভঙ্গি উদ্ভূত নয়, এর কারণ তাঁরা নিজেদের কাজ গুছোতে "শ্রেণী সংগ্রামকে শিল্পের মধ্যে হাতিয়ারের মত ব্যবহার" করছেন। "প্রলেতারীয় সাহিত্য" নাম লেখা ধ্বজাটার তলায় অনেক হুব্বিতম্বিবাজ জমায়েত হয়েছে। গত বছর প্রকাশিত পুস্তক সমূহের বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রকৃতপক্ষে প্রায় সব ক'টিই বিপ্লবী সাহিত্যকর্ম বলে বর্ণিত

হয়েছে, আর কোন প্রতিবাদ উঠলে তা "কোল্ড" করতে সমালোচকেরা গেয়েছেন কাঁদুনি। "শ্রেণী সংগ্রাম"-এর ছত্রছায়ায় এঁরা যেহেতু সাহিত্যকে বসিয়েছেন তাই এঁদের আর স্ব-স্ব উত্তম নিয়োগ করার কোন প্রয়োজন নেই। ফলে, তাঁদের রচনার সঙ্গে কি সাহিত্য, কি বিপ্লব কোনটিরই বিন্দুমাত্র সংশ্রব নেই।

অবশ্য প্রলেতারীয় সাহিত্য যে মাথা তুলছে সে কথা চীনের বর্তমান এই অবস্থা সত্ত্বেও কেউ অপ্রমাণিত করতে পারবে না। মিঃ লিয়াঙ তা জানেন। শেষকালে তিনি তাই স্বীকার করেছেন: প্রলেতারীয় বুদ্ধিজীবীরা যদি তাঁদের প্রপ্যাগাণ্ডাকে প্রলেতারীয় সাহিত্য নামে দাবী করতে থাকেন, সেক্ষেত্রে এটিতে লেখবার এক নতুন রূপ, সাহিত্য ক্ষেত্রে এক নব সাফল্য বলেই আমাদের নিশ্চয় বিবেচনা করতে হবে। সাহিত্য-জগৎ দখল করতে "বুর্জোয়া সাহিত্য নিপাত যাক্" বলে তাঁদের চীৎকার করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ এ জগৎটি এত বড় যে নতুনের স্থান সঙ্কুলানের পক্ষে কোন অসুবিধা হবার কথা নয়।" ওনার এই উক্তি সেই শ্লোগানটার কথা মনে করিয়ে দেয়: "চীন ও জাপান পরস্পরের মিত্র হোক এবং একসাথে পাশাপাশি থেকে উন্নতি করুক!"* অর্ধ অভিজ্ঞ সর্বহারাদের চোখে এই শ্লোগান কিন্তু প্রতারণার-ই শামিল। ভয় হয় যে এখনো এমন প্রলেতারীয় লেখক আছে যারা মিঃ লিয়াঙের সাথে একমত। কিন্তু এরা হল সেই ধরনের "প্রলেতারীয়ান", মিঃ লিয়াঙ যাদের "যোগ্য" বলে বর্ণনা করেছেন। যারা আরোহণ করতে চায় বুর্জোয়া কূলে। এরা যা লেখে তা রাজপ্রাসাদের পরীক্ষায় সফল হবার পূর্বে দরিদ্র শিক্ষার্থীরা যে রকম অভিযোগ করত তার মতই শোনায়। কিন্তু বুর্জোয়া কূলে আরোহণ পূর্বে, আরোহণ কালে এবং তার পরেও এদের হাত দিয়ে প্রলেতারীয় সাহিত্য বেরোয় না। নিজ শ্রেণী ও অন্য সব শ্রেণীর মুক্তিকল্পে শ্রমিকদের সংগ্রামের একটি অংশ প্রলেতারীয় সাহিত্য। সামগ্রিক বিজয়-ই তাঁদের কাম্য, আংশিক নয়।...

* চীনা জনগণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের তোলা ধুয়া।

দু' নম্বর ক্লাউনের প্যাঁচ

দু' নম্বর রঙ মাখা মুখ বা আরো ভদ্রভাবে বললে পর 'দু' নম্বর ক্লাউন' পূর্ব চেকিয়াঙ অপেরার বিভিন্ন চরিত্রগুলোর মধ্যে একটা। ক্লাউনের সঙ্গে এর তফাতটা এই যে ক্লাউনের মত তর্জনগর্জনশীল একটা বেপরোয়া লম্পটের ভান না করে বা কোন মন্ত্রী মশায়ের চাকর সেজে মালিকের ক্ষমতা ব্যবহার করছেন বলে খেলা না দেখিয়ে ইনি একজন তরুণ ভদ্রলোকের দেহরক্ষী বনে যান বা দেখান যে কুকুরের মত আশ্রয়দাতাকে তিনি তোয়াজ করছেন। এক কথায় বলতে গেলে এঁর সামাজিক মর্যাদা ক্লাউনের চেয়ে বেশি কিন্তু চরিত্র তাঁর চাইতে খারাপ।

অনুগত ভৃত্যের অভিনয় যিনি করেন তাঁর মুখে রঙ মাখানো থাকে না। তিনি অনেক সু-উপদেশ দেন ও শেষ পর্যন্ত মনিবের জন্য মৃত্যুবরণ করেন। বদমাইশ ভৃত্যের অভিনয় করে ক্লাউনরা। তারা নানা বাজে কাজ করেও শেষ অবধি অকালে প্রাণ হারায়। কিন্তু দু' নম্বর ক্লাউনের ব্যাপার আলাদা। এঁকে দেখতে অনেকটা ভদ্রলোকের মত-ই। একটু আধটু লায়ার বাজাতে, দাবা খেলতে বা ছবি আঁকতেও জানেন। হাতের লেখাটাও সুন্দর। তাছাড়া ইনি মদ্যপানের খেলায় যোগ দেবার মত বা কূটপ্রশ্নের সমাধান করার মত ক্ষমতা রাখেন। এনার পিছনে কিন্তু মদৎ হিসাবে থাকেন ক্ষমতাশীল ব্যক্তিরা এবং সাধারণ মানুষের ওপর ইনি অহেতুক কর্তৃত্ব খাটান। কেউ যদি নিগৃহীত হয় ইনি তখন সন্তুষ্ট চিত্তে নিষ্ঠুর ভাবে হাসেন। তা বলে কিন্তু সবসময়ই যে ওনার কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় তা নয়, কারণ প্রায়ই তিনি পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়ান দর্শকের কাছে নিজেরু তরুণ মনিবের খুঁত ধরিয়ে দিতে। মাথা নেড়ে মুখভঙ্গি করে বলেন "কাণ্ডটা দেখুন একবার। এই লোকটা এবার না একটা গণ্ডগোলের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে!"

শেষোক্ত কৌশলটি দু'নম্বর ক্লাউনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, কারণ তিনি যেমন অনুগত ভৃত্যের মতন নির্বোধ নন তেমনি একজন অবিনীতের মত

মত শাদামাটা-ও নন। ইনি একজন বুদ্ধিজীবী। ইনি বেশ ভাল ভাবেই জানেন যে, তাঁর পৃষ্ঠপোষক একটি বরফের পাহাড় এবং তা খুব বেশিদিন টিকবে না। পরে তাই তাঁকে অন্য কারুর অধীনে কাজ করতে হবে। তাই যখন তাঁকে কেউ খাওয়ায়-ও বা যখন তিনি প্রতিফলিত যশঃদীপ্তির দরুণ জনপ্রিয়তা অবধি উপভোগ করছেন তখনও তাঁকে দেখাতে হয় যে তিনি কিন্তু সত্যি সত্যিই নিজের মহান মনিবের পক্ষ নিচ্ছেন না।

এটা কিন্তু ঠিক যে দু'নম্বর ক্লাউনরা যেসব অপেরা লিখেছেন তার মধ্যে এই চরিত্রটি অবর্তমান। সত্যিই তাই। এমনকি ক্লাউন বা লম্পটদের হাত দিয়ে যেসব অপেরা লেখা হয়েছে তাতেও এই চরিত্রটি নেই, কারণ এরা চরিত্রটির শুধু একটি দিকের সঙ্গে পরিচিত। আসলে এই ধরনের চরিত্র অনেক দেখে ও তার সার সঙ্কলন করার পর সাধারণ মানুষই দু'নম্বর ক্লাউনকে সৃষ্টি করেছে।

যতদিন ক্ষমতাশালী পরিবাররা থাকবে, ততদিন স্বেচ্ছাচার থাকবে, দু'নম্বর ক্লাউনরা থাকবে এবং দু'নম্বর ক্লাউনের কৌশলও থাকবে। আমরা একটা কাগজ নিয়ে এক সপ্তাহ পড়লে পর দেখবো এই সে বসন্ত কালের প্রতি রুষ্ট হচ্ছে, এই যুদ্ধের প্রশস্তি করছে, এই বার্নার্ড শ'-এর কোনো বক্তৃতার অনুবাদ করছে বা বিবাহ-সমস্যা নিয়ে লিখছে। কিন্তু মাঝে মাঝেই তাকে সরকারের প্রতি নিজের অসন্তোষ ও ক্রোধ জাহির করতে হয়—এটা তার হাতের শেষ প্যাঁচ।

সে যে দালাল নয় তা দেখাবার জন্যে এই প্যাঁচ। কিন্তু সাধারণ মানুষ সবই বোঝে এবং ইতিমধ্যেই তারা মঞ্চে এই চরিত্রটির নকল পেশ করেছে।

বালি

কিছুদিন হ'ল আমাদের বিদ্বৎসমাজে ভারী হাহাকার পড়ে গেছে। তাঁরা বলছেন চীনারা নাকি একথালা ঝুরঝুরে বালি, কোনো কাজের-ই নয়। এইভাবে কোনো বাদবিচার না করে আমাদের যা কিছু দুঃখ-দুর্দশা তার জন্তে সমগ্র জনসাধারণের ঘাড়েই দোষ চড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সত্যি বলতে এর ফলে কিন্তু বেশির ভাগ চীনবাসীর প্রতি অবিচার করাই হয়। সাধারণ মানুষের যদিও পড়াশোনা নেই, পরিষ্কার সিদ্ধান্তে সর্বদা উপনীত হতেও পারেন না, তবু তাঁদের স্বার্থে ঘা লাগছে বলে ধরতে পেরেছেন এমন একটা কিছুর বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হতে পারার মত সামর্থ্য তাঁদের পুরো মাত্রাতেই আছে।. প্রাচীনকালে আমরা সর্বজনসমক্ষে প্রায়শ্চিত্তের, বা বিদ্রোহ ও বিপ্লবের পদ্ধতি চালু থাকতে দেখেছি। আর আজকালকার জনসাধারণ দরখাস্ত বা ঐ একই জাতীয় কায়দা তো ব্যবহার করছেনই। এঁরা যদি বালির মত হন তো তার কারণ এঁদের শাসকরা চেয়েছে যে এরা এই ছাঁচেই গড়ে উঠুক। কথা বলার ক্ল্যাসিকাল ধরন অনুযায়ী বলা যেতে পারে, এঁরা 'সু-শাসিত'।

তাহলে চীনে কি বালি নেই? নিশ্চয় আছে। তা বলে সাধারণ মানুষ নয়, তাঁদের ছোট বড় সব শাসকরাই আসলে বালি।

'সরকারী কাজে পদোন্নতি আর সেই সঙ্গে ঐশ্বর্য' কথাটা প্রায়ই আমাদের কানে আসে। আসলে উক্ত শব্দ দু'টি একার্থক নয়। মানুষ সরকারী কাজে পদোন্নতি চায় ঐশ্বর্য লাভ করতে। দ্বিতীয়টিকে পাবার উপায় স্বরূপ প্রথমটির প্রয়োজন। বড় বড় অফিসাররা তাই কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর আস্থাবান কিন্তু রাজভক্ত নন। তাই ছোট খাটো অফিসাররা স্থানীয় ইয়ামেনের ওপর আস্থাবান কিন্তু তা ভালবাসেন না বা রক্ষা করেন না। তাই বড়কর্তা একটা সৎ ব্যবসায়িক লেন-দেনের নির্দেশ দিলে ছুটকো কর্মচারীরা তার দিকে কোনো নজর দেয় না, আর ভুয়ো রিপোর্ট পেশ করে যাতে নির্দেশ কার্যকর না হয়। এরা সকলেই আত্মকেন্দ্রিক,

আত্মসন্ধানী বালির দানা, যতক্ষণ পারে নিজেদের কোলে ঝোল টানতে একপায়ে খাড়া। এই বালির দানারা প্রত্যেকেই এক একটি সম্রাট এবং এই সম্রাটেরা সম্ভব হলেই অন্যের উপর খবরদারী চালায়। "জায়" কথাটা চীনা ভাষায় "শা-হুয়াঙ" বা "বালুকা-সম্রাট" বলে অনূদিত হয়েছে এবং এই জাতীয় লোকেদের তা মানিয়েওছে সবচেয়ে ভাল। এদের এত ঐশ্বর্য আসে কোত্থেকে? সাধারণ মানুষকে নিঙড়েই এরা তা বার করে আনে। সাধারণ মানুষ যদি দলবদ্ধ হ'ত তাহলে এদের ঐশ্বর্য সঞ্চয় করা শক্ত হয়ে পড়তো। এই জন্যেই এরা বাধ্য হয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করে যায় যাতে দেশটা ঝুরো বালিতে পরিণত হয়। এই সব বালুকা সম্রাটরা দেশের লোকেদের শাসন করছে বলেই সারা চীন আজ 'এক থালা ঝুরো বালি।'

কিন্তু এই বালুকাময় মরুভূমির ওপারে এমন কিছু লোকও আছেন যাঁরা দলবদ্ধ এবং যাঁদের পথ চলা দেখে মনে হয় এঁরা বুঝি "মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি এমন এক দেশে" ঢুকে পড়েছেন।

তার মানে মরুভূমির ব্যাপারে এ একটা বিশাল পরিবর্তন। আগেকার দিনের লোক হ'লে এমনি সময় দুটি ভারী উপযুক্ত তুলনার কথা পাড়তেন: কর্তাব্যক্তিরা লাঙ্গুলবিহীন বানর বা সারসে পরিণত হয়েছেন আর সাধারণ মানুষ হয় কীট নয় বালি।* শাসকরা এসময় সারসের মত মাটি ছেড়ে নীলাকাশে পাড়ি দেয় বা বাঁদরের মতো গাছে চড়ে। একটা "গাছে ভূপাতিত হলে বাঁদররা তখন ছত্রভঙ্গ" হয় কিন্তু আরো অনেক গাছ আছে তাই তারা বিপদে পড়ে না। সাধারণ মানুষরা অবশ্য পিঁপড়ে বা ধুলো নোঙরার মতোই পায়ের তলায় পিষ্ট বা নিহত হতে নীচে পড়ে থাকে। তারা যদি বালুকা-সম্রাটদেরই না প্রতিহত করতে পারে তাহলে স্বয়ং বালুকা-সম্রাট যার কাছে পরাজিত তার বিরুদ্ধে কি করে মাথা তুলে দাঁড়াবে?

সে যাই হোক্, এরকম সময় এমন একজন লোক ঠিক মিলে যায় যে শরের কলম হাতে তুলে আস্ফালন করতে শুরু করে বা ভর্ৎসনা করে জিভ

* 'পাও পুৎযু' থেকে উদ্ধৃত: "মু-রাজের দক্ষিণাভিমুখী অভিযানের সময় সারা সৈন্যবাহিনীর রূপ পরিবর্তন ঘটে যায়। বড়বাবুরা লাঙ্গুলবিহীন বানরে বা সারসে পরিণত হন আর সাধারণ লোকে কীট কি বালি।"

থাকতে থাকে। সাধারণ মানুষকে তখন নিম্নোক্ত রূপ তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে হয়:

"এখন তুমি কি করবে?"

"ভবিষ্যতে তুমি কি করবে?"

সহসাই এদের জনসাধারণের কথা মনে পড়ে যায়। অন্যসব ব্যাপারে টু শব্দটি না উচ্চারণ করে এরা তখন খালি দাবী জানায়, জনগণই অবস্থাটা সামলাক। এ যেন সেই হাত পা বাঁধা মানুষকে ডাকাত ধরতে বলার মতো।

এইটাই কিন্তু বালুকা সম্রাটের মহান সরকারের অন্তিম কার্যসূচী, লাঙ্গুল-বিহীন বানর আর সারসদের শেষবারের মত শ্বাসগ্রহণ, আত্মপ্রশংসা ও আত্মোন্নতির সমাপ্তি—অবশম্ভাবী চূড়ান্ত পরিণতি।

প্রয়োজনাতিরিক্ত বিদ্যা

প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে বিশ্বে একটা অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে। তিন কোটির-ও বেশি শ্রমিক উপোসী, তবু প্রয়োজনাতিরিক্ত শস্যের কথাটা বাস্তব সত্য! তা না হলে আমেরিকা আমাদের ধারে ময়দা দিত না এবং আমরাও প্রভূত পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহের ফলে মারাত্মক দুর্দশায় ভুগতাম না।

এছাড়া প্রয়োজনাতিরিক্ত বিদ্যাও কিন্তু একটা সম্ভাবনা। যার দরুণ আরো বড় রকমের সঙ্কট সৃষ্টি হতে পারে। ওরা বলছে এখন চীনের গ্রামে গ্রামে শিক্ষার যতই প্রসার ঘটবে গ্রামাঞ্চল তত শীঘ্র দেউলে হতে বসবে। এটা যে প্রভূত পরিমাণ মানসিক খাদ্য সংগ্রহের ফলস্বরূপ মারাত্মক দুর্দশা সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তুলো সস্তা বলে আমেরিকানরা তুলোর চাষের পাটই তুলে দিয়েছে। তেমনি চীনেও উচিত হচ্ছে বিদ্যার পাট তুলে দেওয়া। পশ্চিমের কাছে শেখা এ একটা চমৎকার পদ্ধতি।

পশ্চিমীরা ভারী ধীমান। পাঁচ ছ' বছর আগে জার্মানরা অভিযোগ করে বলেছিল তাদের ওখানে কলেজগামী ছাত্রের সংখ্যা খুব বেশি এবং কোনো

কোনো রাজনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ তরুণতরুণীরা যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণ না করে এই মর্মে উপদেশ দিতে সোরগোল বাধিয়েছিল। বর্তমানে জার্মানীতে তারা শুধু উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত নয়, বিদ্যার পাট চুকোবার জন্যে যথাযথ প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিয়েছে: বিশেষ বিশেষ বই পুড়োচ্ছে, লেখকদের নির্দেশ দিচ্ছে নিজেদের পাণ্ডুলিপি নিজেরাই যাতে গলাঃধকরণ করে, শ্রমশিবিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক একটা দলকে আটকে রাখছে—একেই বলে 'বেকার সমস্যার সমাধান করা'। আমরাও কি চীনে এখন এই অভিযোগই করছি না যে বড় বেশি সংখ্যক ছাত্র 'সাহিত্য' আর 'আইন' নিয়ে লেখাপড়া করছে? তাছাড়া আমাদের এখানে যখন উচ্চ বিদ্যালয়গামী ছাত্রের সংখ্যাও বড্ড বেশি, একটা 'কড়া' পরীক্ষা ব্যবস্থাকে লৌহ সম্মার্জনীর মত ব্যবহার করা উচিত—ঝেঁটিয়ে দাও, ঝেঁটিয়ে দাও, ঝেঁটিয়ে দাও।—বেশির ভাগ বুদ্ধিমান তরুণ-তরুণীকেই 'জনতা'র মধ্যে ফেলে দাও।

অতিরিক্ত বিদ্যা কি করে সঙ্কট সৃষ্টি করে? এটা কি সত্যি নয় যে চীনের নব্বই শতাংশ লোকই নিরক্ষর? কথাটি ঠিকই—কিন্তু সে যাই হোক না কেন অতিরিক্ত বিদ্যার ফলে একটা সঙ্কট যে সৃষ্টি হয় সেটা কিন্তু 'বাস্তব সত্য'। খুব বেশি বিদ্বান হলে হয় তুমি বড় বেশি ভাবুক হয়ে উঠবে আর নয়তো খুব দয়ালু। যদি বড় বেশি ভাবুক হও তাহলে বড় বেশি চিন্তা করার ঝোঁক দেখা দেবে। যদি খুব দয়ালু হও তাহলে কিছুতেই নিষ্ঠুর হতে পারবে না। হয় নিজের মনের প্রশান্তি হারাবে নয়তো অন্যের প্রশান্তির ব্যাঘাত ঘটাবে—সঙ্কটের সৃষ্টি তো এইভাবেই। অতএব—বিদ্যার পাট চুকিয়ে দাও। কিন্তু সোজাসুজি বিদ্যার পাট চুকিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। উপযুক্তভাবে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়াটা দরকার। এই ব্যাপারে সর্বপ্রথম প্রয়োজন অদৃষ্টবাদী দর্শন—মানুষকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দেওয়া, তার ভাগ্য যদি মন্দ হয় তবু তাকে সন্তুষ্ট থাকতে বলা। দ্বিতীয় প্রয়োজন—অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করার মত জ্ঞানগম্যি রাখা। লক্ষ্য রাখা কোনদিকে হাওয়া বইছে এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষমতা সম্বন্ধে কিছু জেনে নেওয়া। অন্ততপক্ষে এই দু'টি কার্যকরী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে অবিলম্বে চালু করা উচিত। চালু করার কায়দাটা খুব সহজ। আগেকার দিনে ভাববাদী চিন্তাধারা বিরোধী দার্শনিকরা বলতেন যে কারুর যদি সন্দেহ হয় যে একবাটি ময়দার কোনো অস্তিত্ব আছে কি না তাহলে তার সেটা খেয়ে নিয়ে তারপর দেখা উচিত তৃপ্তি পেল কি

না। তেমনি আজ যদি কাউকে বিদ্যুতের কথা বোঝাতে হয় তাহলে তার ওপর বৈদ্যুতিক শিহরণ প্রয়োগ করে তারপর দেখতে হবে কষ্ট পাচ্ছে কি না। যদি তাদের এরোপ্লেন বা ঐ ধরনের কিছুর উপযোগিতা বোঝাতে হয় তাহলে তাদের মাথার উপর এরোপ্লেন উড়িয়ে বোমা ফেলে দেখা উচিত তারা মরছে কি না…

এই ভাবে হাতে কলমে শিক্ষা পেলে আর প্রয়োজনাতিরিক্ত বিদ্যা বলে কিছু থাকবে না। ওঁ শান্তি।

শরতকালের গোড়ায় কয়েকটি চিন্তা

দরজার বাইরে ছোট্ট এক ফালি জমিটার ওপর পিঁপড়েদের দুই সামরিক বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ চলেছে।

বিবিধ লোক-কাহিনীর (Folk Tales) লেখক এরোশেঙ্কোর নাম পাঠকের স্মৃতি থেকে আবছা হয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু এইমাত্র আমার মনে পড়লো যে তাঁর একটা অদ্ভুত ভয় ছিল। পিকিঙে থাকবার সময় একবার তিনি আমায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভাবে বলেছিলেন: "আমার বড় ভয় হয় যে ভবিষ্যতে ওরা না এমন একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করে বসে যার ফলে মুহূর্তের মধ্যে মানুষকে যুদ্ধ-যন্ত্রে পরিণত করে ফেলা যায়।"

এরকম একটা পদ্ধতি কিন্তু বহুদিন আগেই আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে সেটা একটু জটিল গোছের, মুহূর্তের মধ্যে কাজ সারতে পারেনা। কি করে অস্ত্র ব্যবহার করতে হয় প্রধানত এই কথাটাই শেখানোর উদ্দেশ্যে বাচ্চাদের জন্যে যেসব বিদেশী বই বা খেলনা রয়েছে সেগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে যুদ্ধযন্ত্র তৈরী করার মতো উপকরণ সবই এখানে রয়েছে। নিষ্পাপ শিশুদের ওপরেই যুদ্ধযন্ত্র তৈরীর প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে।

শুধু মানুষ কেন কীটরাও একথা জানে। একটি করে 'যোদ্ধা' পিঁপড়ে আছে যে কখনো গৃহ নির্মাণ করে না বা খাবারের সন্ধান করে না, সারা জীবন কেবল অন্য পিঁপড়ের ওপর আক্রমণই চালিয়ে যায়, আর তাদের বাচ্চাদের ধরে আনে নিজের ক্রীতদাস করে রাখতে। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার কিন্তু এই যে এরা

কখনো বড় বড় পিঁপড়েকে গ্রেপ্তার করে না। কারণ তাদের আবার নতুন করে সব শিখিতে পড়িয়ে নেওয়াটা বড় শক্ত। তাই অনিবার্য ভাবে শুধু বাচ্চা পিঁপড়ে বা লার্ভাকে নিয়ে আসা হয় যাতে তারা ডাকাতের আড্ডায় পূর্বস্মৃতি ব্যতিরেকেই বড় হয়ে ওঠে, বুদ্ধি বলতে কিছু না থাকে—চিরকালের জন্ম অনুগত ক্রীতদাসে পরিণত হয়। এরা যে শুধু ক্রীতদাস হয়েই থাকে তাই নয়, যোদ্ধা যখন হানা দিতে বেরোয় এরা তখন তার পশ্চাদনুসরণ করে। স্বজাতির যেসব তরুণ পিঁপড়ে ও লার্ভাদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়েছে তাদের বয়ে আনার কাজে সাহায্য করে।

তা বলে মানুষের বেলায় এরকম কোনো সোজাসুজি নিয়ম খাড়া করা যায় না। আর তা যায় না বলেই তো মানুষ সব সৃষ্টির সেরা।

তবুও উৎপাদনকারীরা আশা ছাড়ে না। বাচ্চা ছেলেরা বড় হবার পর শুধু যে নিজের সরলতাটুকু হারায় তাই নয়—কেমন বোকা আর নির্বোধ হয়ে পড়ে—যেমনটি আমার আখছার দেখছি। অর্থনৈতিক মন্দা প্রকাশককে বিজ্ঞান বা সাহিত্যের ওপর বৃহদাকার পুস্তক প্রকাশনে অনিচ্ছুক করে তুলেছে, কিন্তু স্কুলের পাঠ্যপুস্তক আর বাচ্ছাদের বইয়ের বন্যা বইছে বাজারে। যেন হলুদ নদী তার বাঁধ ভেঙে ছুটে চলেছে। এইসব পুস্তকের বিষয়বস্তু কি? আমাদের ছেলে-মেয়েদের ওপর এদের প্রভাবের ফল কি হতে পারে? যুদ্ধং দেহি সব সমালোচকদের কিন্তু এইসব প্রশ্নের জবাবে কখনো কিছু বলতে শুনিনি। মনে হচ্ছে যে ভবিষ্যত নিয়ে খুব কম লোকেই মাথা ঘামায়।

খবরের কাগজে অস্ত্রসংবরণ চুক্তির ওপর যখন খবরাখবর অল্প-ই বেরোচ্ছে তখন বুঝতে হবে চীনে যুদ্ধ খুব জনপ্রিয়। আর যদি বা কোনো খবর থাকে সে সম্বন্ধে আমাদের নিরুৎসাহতা বুঝিয়ে দেয় যে এসব আমাদের প্রবৃত্তি বিরোধী। অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে—সৈনিক পিঁপড়েকে অনুসরণ করে পরাজিতদের লার্ভা বহন করা ক্রীতদাসের পক্ষে এক প্রকার বিজয় বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যে মানুষ 'সব সৃষ্টির সেরা', তার পক্ষে এটাই সব নয়। অবশ্যই আমরা যুদ্ধ করবো। সেই সব পিঁপড়ের ঢিপি আমরা তাণ্ডবই যেখানে চলেছে যুদ্ধযন্ত্রের উৎপাদন, তাণ্ডব ছেলেদের মন বিষোতে চিনি মাথা যত বড়ি বেরিয়েছে, তাণ্ডব আমাদের ভবিষ্যতকে ধ্বংস করার সব চক্রান্ত। মানুষ যোদ্ধাদের এই কাজটাই কেবল মানায়।

ভাঁড় হবার গোপন কথা

কিয়ের্কেগার্ড ডেনমার্কের লোক। জীবন সম্বন্ধে তিনি একটা বিষণ্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। তাঁর সব লেখাই ক্ষুব্ধ মনোভাবের পরিচায়ক। কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি কিছু কিছু মজার কথাও বলেছেন, যেমন :

"একটা নাট্যালয়ে আগুন ধরে যায়। ক্লাউন মঞ্চের সামনে এগিয়ে দর্শকদের কাছে তা ঘোষণা করলে সবাই তামাশা ভেবে হাততালি দিয়ে ওঠে। তখন ক্লাউন আবার বলে যে আগুন লেগেছে। কিন্তু দর্শকরা হাসির দমকে ফেটে পড়ে, হাততালির আওয়াজ সব দৃষ্টান্ত ছাড়িয়ে যায়। কোনো সন্দেহ নেই যে পৃথিবী একদিন এই হাস্যপ্রিয় লোকেদের, যারা সব কিছুকেই তামাশা বলে মনে করে, তাদের সশব্দ করতালি আর প্রশংসার মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে।"

অবশ্য আমি যে শুধু এই অংশটা পড়েই মজা পাচ্ছি তা নয়। মজা পাচ্ছি যখন দেখছি এটা পড়ে এই সব ভাঁড়দের চাতুর্যের কথা কেমন মনে পড়ে যাচ্ছে। হাতে কাজ থাকলে এরা সর্বদাই সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। তার মানে এদের মনিবরা যখন কোনো অপরাধী কার্যকলাপ সম্পন্ন করতে উদ্যত হয়, এরা তখন সাহায্যকারীর ভূমিকা নেয়। এরা কিন্তু এমন ভাবে সাহায্য করে যে কোন ক্ষেত্রে যদি রক্তপাতও ঘটে এদের গায়ে তার ছিটেফোঁটা দেখতে পাওয়া যায় না, এসবের গন্ধ পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

সবাই খুব গুরুত্ব দিচ্ছে এমনি যে কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথাই না হয় ধরুন। ভাঁড় মশাই তখন ক্লাউনের বেশে আবির্ভূত হয়ে এটাকে একটা হাসির ব্যাপার করে তোলেন কিংবা ঘটনাটার এমন একটা অপ্রাসঙ্গিক অংশকে ফেনিয়ে তুলতে শুরু করেন যে ঘটনাটার আসল তাৎপর্য লোকের কাছে পরিস্ফুট হতে পারে না। একেই বলে 'ঘোকাজ জল করা'। কেউ যখন খুন হয় এঁরা তখন হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য আর

ডিটেকটিভদের গুরু কর্তব্যের বিবরণ দেন। আর কোনো মহিলা যদি খুন হয়ে থাকেন তাহলে তো কথাই নেই—ভাঁড় মশাই তখন তাকে 'সুন্দরীর শব' আখ্যা দিতে বা তার ডায়েরিখানা প্রকাশিত করতে পারেন। তা নয়তো এটা যদি কোন রাজনৈতিক হত্যার ব্যাপার হয় উনি তখন মৃতের জীবন কাহিনী শোনান—প্রেমঘটিত ব্যাপার বা তার জীবনের কোনো কোনো বিশেষ ঘটনা বিবৃত করেন। ভাবাবেগ আপনা হতেই আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে আসে ঠিকই, কিন্তু ঠাণ্ডা জল বা আরো সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে "সবুজ চা" কিন্তু এই 'ঠাণ্ডা মেরে যাওয়া'র প্রক্রিয়া আরো দ্রুততর করবে। তাই অতঃপর এতক্ষণ যিনি বোকার ভান করেছিলেন তিনি সাহিত্যের রাজ্যে পদার্পণ করেন।

এখন যদি কোনক্ষেত্রে মানুষ এ ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ার আগেই একটা গুরুতর রকমের সোরগোল পড়ে যায় তাহলে কিন্তু সেটা হত্যাকারীর পক্ষে সত্যিই খারাপ হবে। অবশ্য ভাঁড় মশাই তখন আবার বোকার ভান করতে পারেন। তাঁর ঠাট্টা তামাশা আর মুখভঙ্গি এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করবে যার ফলে যে ভদ্রলোক সোরগোল বাধিয়েছিলেন তাঁকেই এবার ক্লাউনের মত লাগবে। সবাইকে সাবধান করে দিয়ে তিনি যে কথাগুলো বলেছিলেন তা হাস্যকর শোনাবে। ভাঁড় মশাই কুঁকড়ে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে দেখিয়ে দেবেন যে অন্য ব্যক্তিটি কত বিত্তবান, কত শক্তিশালী। উনি কুর্নিশ করে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, অপর ব্যক্তিটির দেমাক কত তার নমুনা দেবেন। অতঃপর যে ভদ্রলোক সোরগোল বাধিয়েছিলেন তাঁকেই সবাই ভণ্ড বলে ধরে নেবে। ভাগ্য ভাল যে ভাঁড়দের মধ্যে বলতে গেলে সবাই পুরুষ মানুষ—তা যদি না হ'ত তো যে ব্যক্তিটি সবাইকে সাবধান হতে বলেছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে এরা নিশ্চয় এই অভিযোগ আনত যে এই ভদ্রলোক মেয়েদের ভুলিয়ে ভালিয়ে কুপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। তারপর সবাইকে সেকথা জানাতে গিয়ে ভাঁড়ের দল নানা অশ্লীল ঘটনার বিবরণ দিত এবং শেষ পর্যন্ত মেয়েরা নিজেদের হাতে নিজেরা প্রাণ বিসর্জন দেবার ভান করত। চারপাশ জুড়ে খালি ভাঁড় থাকলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাও তার শক্তি হারায় এবং এই সন্দেহের আর হাস্যরোলের মাঝে পড়ে হত্যাকারীর পক্ষে অসুবিধাজনক প্রসঙ্গ সমূহ আর উত্থাপিত হয় না।

এ ধরনের কোনো ঘটনা যদি সন্ধানে না থাকে ভাঁড়রা তখন সপ্তাহে

সপ্তাহে একবার কি দশদিনে একবার করে সংবাদপত্রের সঙ্গে যে সংযোজনী বের হয় তার অঙ্গে গল্প-গুজব সংগ্রহ করে—পাঠকদের মাথায় গেদে দেবে বলে। ছ'মাস কি এক বছর ধরে এই সব পড়বার পর একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি কেমন করে মাজং বাজান বা একজন ফিল্ম স্টার কেমন করে হাঁচেন ইত্যাদি গল্পে আপনার মাথা দেখবেন ভরপুর। স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপারটা ভারী মজাদার। কিন্তু হাস্যপ্রিয় এই সব মানুষের হাস্যরোলের মাঝে পৃথিবীকেও একদিন ঠিক খতম করে দেওয়া হবে।

দু'চার কথা

২০শে সেপ্টেম্বরের 'শান-পাও'-এ চিয়াশান অঞ্চলের একটা খবর পরিবেশিত হয়। তার অংশবিশেষ নিম্নরূপ :

এই প্রদেশের টেয়াও গ্রামের শেন হো-শেঙ ও তাঁর পুত্র লিও-শেঙকে শি-তাও (কনিষ্ঠ) নামে এক ডাকাত চুরি করে নিয়ে যায় ও মুক্তিপণ হিসাবে তিরিশ হাজার ডলার দাবী করে। শেঙ বংশের অবস্থা এমন একটা কিছু খানদানি নয় বলে তাঁদের পরিবার কিছু করবার আগে একটু সময় নেন। তখন ডাকাতরা শেঙ ও তাঁর পুত্রকে ও সেই সঙ্গে আরো কিছু ব্যক্তি যাদের কিয়াংশু থেকে চুরি করে আনা হয়েছিল, সবাইকে টিঙপেঙের উত্তরে নিয়ে যায় ও নিষ্ঠুর অত্যাচার করে। অপরিশুদ্ধ বার্ণিশ মাখানো কাপড়ের টুকরো তাদের পিঠে চিটিয়ে দেয়। তারপর সেটা খানিকটা শুকিয়ে এলে পরে কাপড়টা টেনে তুলে নেয়—তার সঙ্গে মানুষগুলোর গায়ের চামড়াও ছিঁড়ে উঠে আসে। এর ফলে দুঃসহ যন্ত্রণায় তাঁরা দয়া প্রার্থনা করে হৃদয়বিদারী আর্তনাদ করেন। যেসব স্থানীয় জনসাধারণ ঘটনাটি দেখেছিলেন তাঁরা এঁদের প্রতি করুণাবশত শেঙ পরিবারের কাছে দুঃসংবাদটি প্রেরণ করেন। সাবধান করে দিয়ে জানিয়ে দেন অবিলম্বে যদি টাকা না দেওয়া হয় তো এই দু'জনের আর প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা কম। এই সব ডাকাতদের নিষ্ঠুরতা অতীব ভয়াবহ!

'অত্যাচারের গল্প' নানা দেশের পত্র পত্রিকাতেই ক্রমাগত প্রকাশিত হচ্ছে। তবু আমরা যখন পড়ি তখনই খালি একবার শিউরে উঠি। কিছুক্ষণ বাদে আর কিছু মনে থাকে না, কারণ সত্যি বলতে কি এতসব মনে রাখা সম্ভব নয়। তাবলে অত্যাচারের এসব কায়দা কিন্তু একদিনে আবিষ্কৃত হয়নি—পূর্বপুরুষদের হাত ঘুরে এসেছে। যেমন শি-তাও (কনিষ্ঠ) যে কায়দাটি ব্যবহার করেছে তা অনেক অনেক দিনকার। বিদ্বৎসমাজ এসব পড়ে ভুরু কুঁচকোতে পারেন বটে কিন্তু নীচের তলার অধিকাংশই 'ইউয়ে-ফাই-এর গল্প'র সেই অধ্যায়টির কথা জানেন, যেখানে চিন কুঁয়াইয়ের ইচ্ছে ইউয়ে ফাই স্বীকার করে নিক্ যে সে একজন বিশ্বাসঘাতক এবং এই মর্মে স্বীকারোক্তি আদায় করতে তিনি দড়ির টুকরো ও গঁদ ব্যবহার করেছিলেন। অপরিশুদ্ধ বার্ণিশ ব্যবহার হয়েছে বলে যে কথা শুনছি সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে, কারণ বার্ণিশ শুকোতে বড় বেশি সময় নেয়।

অত্যাচারের নানা উপায় আবিষ্কার ও উন্নতি সাধনের কাজটি সম্পন্ন করেছে স্বেচ্ছাচারী ও ধর্ষকামী শাসকবৃন্দ। সত্যি বলতে এরা শুধুমাত্র এই একটা কাজই করবার পক্ষে উপযুক্ত এবং কাজটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সারার মত তাদের হাতে সময়ও অঢেল। এই অত্যাচারের সাহায্য নিয়েই না তারা মানুষকে ভয় দেখায়—বিশ্বাসঘাতকদের উচ্ছেদ করে। কিন্তু লাও-ৎসু তো পরিষ্কার ভাবে বলেই গেছেন যে: "তুমি যদি পেক্ আর বুশেলের সাহায্যে জিনিস ওজন কর তো লোকে তোমার ঐ ওজনগুলোই কেড়ে নেবে।"* ঠিক তেমনি যারা অত্যাচারিত হবার পক্ষে সুযোগ্য বলে বিবেচিত হয় তারাও পরে একই খেলা খেলতে আরম্ভ করে। চাঙ শিয়েন-চুঙ-এর একটা মানুষকে ছাল ছাড়িয়ে মেরে ফেলবার ঘটনা সত্যিই ভয়াবহ। তবে কিনা তার সামনে ছিল সম্রাট ইয়ুঙ-লো'র দৃষ্টান্ত। এই সম্রাট তাঁর 'অবিনীত মন্ত্রী' চিঙ চিঙ-কে একইভাবে হত্যা করেছিল।**

যে সব ক্রীতদাস অত্যাচারের মধ্যে পালিত তারা অন্যের জন্যে অত্যাচারকেই উপযুক্ত দাওয়াই বলে মনে করে।

---

* আসলে উক্তিটি চুয়াঙৎসু'র।

** সম্রাট ইয়ুঙ লো অন্যায়ভাবে সম্রাট চিয়েন ওয়েন-এর গদি কেড়ে নেয়। চিঙ চিঙ ছিলেন সম্রাট চিয়েন ওয়েন-এর একজন মন্ত্রী। তিনি এই অন্যায়ের প্রতিবাদে বিজেতার সঙ্গে কাজ করতে অসম্মত হ'ন।

অত্যাচারের ফলাফল সংক্রান্ত বিষয়ে কিন্তু মনিব ও ক্রীতদাসের মধ্যে মতভেদ আছে। মনিবরা ও তাঁদের তোষামুদে সহচরগণ কিঞ্চিৎ শিক্ষাপ্রাপ্ত, তাই শত্রুকে কি পরিমাণ যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে তা তাঁরা আগের থেকেই আন্দাজ করতে সক্ষম। এর ফলে তাঁদের পক্ষে অত্যাচারের নতুন কায়দা বার করা বা চলতি উপায়ের উন্নতিসাধন করা সহজসাধ্য। ওদিকে ক্রীতদাসরা কিন্তু বোকা হতে বাধ্য। তারা 'নিজেদের দিয়ে অন্যের বিচার' করতে অক্ষম আর 'একই অনুভূতির ভাগিদার' হবার প্রশ্ন তো আরো সুদূর। একবার ক্ষমতায় এলে তারা হয়তো ঐতিহ্যগত প্রথার ব্যবহার করলেও করতে পারে কিন্তু তাবলে নিষ্ঠুরতার ব্যাপারে এইসব শিক্ষিত মানুষ, যাঁরা আবার কল্পনাক্ষম, তারা তাদের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারবে না। 'লৌহ নদী'তে সেরাফিমোভিচ বর্ণনা করেছেন যে কিছু সংখ্যক কৃষক যখন এক অভিজাত ঘরের কন্যাকে হত্যা করে তখন তার মা কেমন শোকে দুঃখে কান্নায় ভেঙে পড়ে। "কাঁদছ কেন?" তারা জিজ্ঞেস করেছিল। "আমাদেরও তো অনেক ছেলেপুলে মরে গেছে। আমরা তো কই কাঁদিনি।" এটা নিষ্ঠুরতা নয়। তারা বিস্মিত হয়েছিল, কারণ একটা মানুষের জীবন যে কত দামী হতে পারে তা তারা জানত না।

যেসব ক্রীতদাসদের শুয়োর আর কুকুরদের সঙ্গে এক করে দেখা হয় তাদের ধারণায় মানুষের সঙ্গে শুয়োর বা কুকুরের কোন পার্থক্য নেই।

তাই এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে যাদের ঘরে ক্রীতদাস বা আধা ক্রীতদাস রয়েছে তারা 'ক্রীতদাস বিদ্রোহ'কেই শুধুমাত্র ভয় পায়।

'ক্রীতদাস-বিদ্রোহ'কে ঠেকাতে এরা আরো বেশি পরিমাণে অত্যাচার চালাচ্ছে বলেই অত্যাচার আর পূর্বের মত ফলপ্রসূ হচ্ছে না। দাঁড় করিয়ে রেখে গুলি চালিয়ে হত্যা করবার জন্য সৈন্য মোতায়নের মধ্যে এখন আর কোনো নতুনত্ব নেই। কাটা মাথা বা মৃতদেহ ঝুলিয়ে রাখলে লোকে বড়জোর খানিকক্ষণের জন্যে মজা পায়। এত কাণ্ডের পরও ডাকাত, মানুষহরণকারী ও অপরাধীদের সংখ্যা একটুও কমেনি। মানুষহরণকারীরা পর্যন্ত এখন অত্যাচার করতে শুরু করেছে। নিষ্ঠুর শিক্ষা মানুষকে নিষ্ঠুরতার প্রতি উদাসীন করে তোলে। তাই যখন প্রথম বিনা কারণে কিছু নাগরিককে হত্যা করা হয়েছিল, লোকে উচ্চকণ্ঠে তার প্রতিবাদ করেছিল। আজকাল কিন্তু হত্যাকাণ্ড জল-খাবার খাওয়ার মতই নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে পড়েছে। মানুষকে এমন অবস্থার মধ্যে রাখা হয়েছে যাতে স্থূলচর্মবিশিষ্ট মেয়ো হাতীদের মতই তার গায়ের চামড়া মোটা হতে

পারে। আর ঠিক এই মোটা চামড়ার দৌলতেই মানুষ এখনো এগিয়ে চলেছে সব অত্যাচার কে তুচ্ছ করে। ধর্ষকামী বড় বড় সরকারী চাকুরে আর স্বেচ্ছাচারী শাসকরা এই ব্যাপারটা আগে থেকে আঁচ করতে পারেনি। আর যদি বা পারত সেক্ষেত্রেও তা রোধ করার মত কিছু করবার থাকত না।

বিক্ষিপ্ত চিন্তা

মানুষ জন্তুদের চেয়ে উন্নত শ্রেণীর জীব, মানুষ কাঁদতে জানে। কিন্তু মানুষ যে নিঁখুত নয় এই কান্নাই আবার সে কথা প্রমাণ করে দেয়। যেমন অ্যাপেনডিক্স আছে বলে মানুষকে পাখীদের চেয়ে উন্নতশ্রেণীভুক্ত বলা চলে কিন্তু সেই সঙ্গে ঠিক এই জিনিসটির অস্তিত্বই আবার প্রমাণ করে দেয় যে মানুষ মোটেই নিখুঁত নয়। কান্না ও অ্যাপেনডিক্স জাতীয় জিনিষের কোন প্রয়োজন তো নেই-ই উল্টে এরাই মানুষকে অকারণে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।

একালের লোকে অশ্রুর অর্ঘ্য নিবেদন করে। এরা এটাকেই শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য বলে মনে করে কারণ এছাড়া এদের আর কিছু নেই। কিন্তু যাদের চোখে অশ্রু নেই তারা নিজেদের রক্ত দিয়ে অর্ঘ্য নিবেদন করে অথচ অন্যের রক্ত ঝরাতে রাজি হয় না।

লোকে যাদের ভালোবাসে তাদের তারা কাঁদাতে চায় না। কিন্তু তা বলে কেউ যখন মারা যায় সে কী চায় না যে তার প্রিয়জনেরা কাঁদুক? না—যাদের চোখে অশ্রু নেই তারা কখনোই চায় না তার প্রিয়জনেরা কাঁদুক, এমন কী কেউ রক্ত ঝরাক সেটাও তারা অপছন্দ করে। নিজেদের সুবিধার জন্যে কান্না ও ধ্বংসলীলার কোন প্রয়োজন আছে বলে তারা মানে না।

"কী মানুষ, কী শয়তান, সবার অগোচরে" নিহত হবার চেয়ে সহস্র লোকের সামনে নিহত হওয়াই বরং ভাল। কারণ যে নিহত হচ্ছে সে অন্তত ভাবতে পারবে যে সমবেত জনতার কেউ কেউ অন্তত চোখের জল ফেলবে। কিন্তু যাদের চোখে অশ্রু নেই তারা তাদের কোন জায়গায় খুন করা হচ্ছে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন নয়।

অস্ত্রহীন মানুষকে খুন করার পর কোন রক্তের দাগ চোখে পড়বে না। নিহত লোকটির প্রিয়জনেরা যেমন তার মৃত্যুতে যন্ত্রণা পাবে না তেমনি তার শত্রুরাও তাকে খুন করে কোন উল্লাস ভোগ করতে পারবে না। অস্ত্রহীন মানুষ এইভাবেই কাউকে তার কৃতজ্ঞতা জানায় আর কারুর ওপর প্রতিশোধ নেয়।

*　　*　　*

শত্রুর তরবারির আঘাতে মরার মধ্যে কোন শোকের ব্যাপার নেই কিন্তু একটা অপ্রত্যাশিত গোপন অস্ত্রের ঘায়ে মরাটা দুঃখজনক। তবু বলব সবচেয়ে দুঃখজনক মৃত্যু হচ্ছে স্নেহশীলা মা বা প্রেমাস্পদ যখন ভুল করে বিষ প্রয়োগ করে তাঁর আপনজনের মৃত্যু ঘটান। কিংবা ঘনিষ্ঠ কমরেডের রাইফেল থেকে অকস্মাৎ ছিটকে আসা গুলিতে যখন মৃত্যু হয়, যখন এমন একটা জীবাণুর সংক্রমণে মৃত্যু ঘটে যা মোটেই ক্ষতিকারক নয়। তাছাড়া পাঁচজনে মিলে যখন একটি মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্ত কারুর ঘাড়ে চড়িয়ে দেন সেটিও সমান দুঃখজনক।

*　　*　　*

যারা অতীতের স্মৃতি নিয়ে মশগুল তারা বরং অতীতকালেই ফিরে যাক। যারা এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চায় তারা বরং তাই যাক্। যারা স্বর্গারোহণ করতে চায় তারা বরং তাই করুক। যারা চায় তাদের আত্মা জড় দেহ ত্যাগ করুক তারা বরং চটপট মরুক। বর্তমান কালের ওপর, এ পৃথিবীর ওপর যাদের দৃঢ় কর্তৃত্ব আছে একমাত্র তারাই আজকের এ পৃথিবীতে বাস করার যোগ্য।

এ-পৃথিবীকে যারা ঘৃণা করে তারাও কিন্তু সেই পৃথিবীতেই এখনো রয়েছে। বর্তমানে এরাই পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক খুনে শত্রু। এরা যতদিন থাকবে পৃথিবীকে রক্ষা করা যাবে না।

প্রাচীনকালে অনেকেই আমাদের এই পৃথিবীতে বাঁচতে চেয়েও বাঁচতে পারেনি। এদের অনেকেই মুখ বুজে দিন কাটিয়েছে, কেউ কেউ যন্ত্রণায় গোঙিয়েছে, কেউ দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে, কেঁদেছে বা প্রার্থনা জানিয়েছে। কিন্তু এত করেও তারা আমাদের এই পৃথিবীতে বাঁচতে পারেনি কারণ কী করে রাগতে হয় সেটা তারা ভুলে গেছল।

একজন সাহসী মানুষ যখন রেগে যায় সে তার চেয়ে বেশি ক্ষমতাধর

কোন লোকের নাকের ডগাতেই তরোয়ালখানা উঁচিয়ে ধরে। ক্রুদ্ধ জনতা কিন্তু নিজেদের চেয়ে দুর্বল লোকেদেরই শুধু শাসানি দেয়। এদের কোনদিনই এই রোগ সারবার সম্ভাবনা নেই। এদের মধ্যে নিশ্চয় এমন অনেক বীর রয়েছেন যাঁরা কেবল শিশুদের দিকেই জ্বলন্ত চোখে চাইতে পারেন! কাপুরুষের দল!

যে শিশুরা এদের এই জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি দেখতে দেখতেই বড় হয়ে উঠেছে তারা আবার অন্য শিশুদের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকায় আর ভাবে যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধভঙ্গিতেই তারা সারাটা জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। এদের ক্রোধের দৌড় এইটুকু বলেই আজীবন এরা ক্রুদ্ধ। এদের এই বিশেষ ক্রোধ বংশানুক্রমিক ইতিহাসের অন্ত অবধি চলতে থাকবে।

* * *

খাদ্যদ্রব্য, প্রেমাস্পদ, নিজের দেশ বা মানবজাতি—আপনি যা-ই ভালবাসুন না কেন সেটিকে জিতে নিতে হলে একটা বিষাক্ত সাপের মতো তার গায়ে গায়ে জড়িয়ে থাকতে হবে। প্রতিশোধ গ্রহণকারীর মতো তাকে শক্ত করে ধরতে হবে এবং মুহূর্তের জন্যেও এ-প্রয়াসে শিথিলতা দেওয়া চলবে না। একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়লে সামান্য বিশ্রাম নিতে পারেন কিন্তু বিশ্রামের পর আবার চেষ্টা করতে হবে—বার বার চেষ্টা করতে হবে। তা বলে কিন্তু রক্তের অক্ষরে চিঠি লিখে, খসড়া নিয়মকানুন রচনা করে, আবেদন পেশ করে, বক্তৃতা দিয়ে, চোখের জল ফেলে, টেলিগ্রাম পাঠিয়ে, মিটিঙ ডেকে, শোকগাথা রচনা করে, ভাষণ দিয়ে বা স্নায়ুবৈকল্যে ভেঙে পড়ে কোন ফলই হবে না।

রক্ত দিয়ে লেখা একটা চিঠি আপনার জন্যে কী করতে পারে? আপনার নিজের রক্তে লেখা এই চিঠি শুধু চিঠিই, দেখতে অবধি ভাল লাগে না। আর স্নায়বিক বৈকল্যের কথা যদি ওঠে তো বলবো আপনি আসলে সুস্থই নন্। আর বলবো, ওহে আমার শ্রদ্ধাভাজন ও বিরক্তিকর বন্ধু, এ নিয়ে সগৌরবে ঘোষণা করার কিছুই নেই।

গোঙানি, দীর্ঘশ্বাস, কান্না বা অনুনয়-বিনয় কানে এলে অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু যেই দেখা যাবে একটা তীব্র নীরবতা সৃষ্টি হচ্ছে সতর্ক হয়ে যেতে হবে। তাছাড়া শবদেহের মাঝ দিয়ে যখন বিষাক্ত সাপের মতো একটা কিছুকে এঁকেবেঁকে এগোতে দেখা যাবে বা প্রতিশোধ গ্রহণে

ব্যগ্র কোন শক্তিকে যখন অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ছুটতে দেখা যাবে তখন আমাদের আরো সতর্ক হওয়া দরকার। কারণ এটাই একটা সঙ্কেত যে "সত্যিকারের ঝড়" আসছে। যারা অতীতের স্মৃতি নিয়ে মশগুল, যারা এ-পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চায়, যারা স্বর্গারোহণ করতে ইচ্ছুক, যাদের আত্মা জড়দেহ ত্যাগ করতে ব্যাকুল—এরা সেদিন সবাই আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেবে—

যে গোলাপ আর ফুটবে না

চীন রিপাবলিকের পঞ্চদশ বছরের ১৮ই মার্চ তুয়ান চি-জুই সরকারের আদেশে সৈন্যদল রাইফেল আর তরোয়াল হাতে শত শত তরুণকে ঘিরে ধরল, অবাধ নরমেধ চালিয়ে গেল। এই তরুণের দল আমাদেরই বৈদেশিক নীতির প্রতি সমর্থন জানাতে নিরস্ত্র অবস্থায় সরকারী ভবনে এসেছিল, আর তাই বোধহয় সরকার ডিক্রিজারী করে তাদের "দাঙ্গাকারী জনতা" খেতাব দিল।

এমন কদর্য অত্যাচার পশুজগতে দেখা তো যায়-ই না, মানুষের সমাজেও বিরল। বোধহয় একটি মাত্র দৃষ্টান্ত আছে যার সঙ্গে এই অবাধ নরহত্যার কিঞ্চিৎ মিল পাওয়া যায়—রাশিয়ার জার দ্বিতীয় নিকোলাসের আদেশে কসাকদেরও অনেকটা এইরকম পাইকারী হারে বধ করা হয়েছিল।

বাঘে আর নেকড়েতে মিলে চীনকে এখন ছিঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে কিন্তু তবু কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। একমাত্র গুটিকয়েক ছাত্রই যা দেখা যাচ্ছে এর জন্যে চিন্তিত। অথচ এদের শুধু লেখাপড়া নিয়েই থাকবার কথা। কিন্তু এরা তা পারছে না কারণ এরা আজ অত্যন্ত বিচলিত। আমাদের কর্তৃপক্ষের যদি এতটুকুও বিবেকবোধ থাকতো তাহলে তারা ভুল স্বীকার করে নিত। অন্তত পক্ষে নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে যা সত্য বলে মনে করছে সেটুকু মেনে নিতে দ্বিধা করতো না।

কিন্তু এরা কিনা স্রেফ ছেলেগুলোকে খুন করে ছাড়ল

একে একে তরুণদের প্রত্যেককেও যদি খুন করা যায় তবুও হত্যাকারীরা কখনো জয়ী হতে পারবে না।

চীনের বিনাশ ঘটলে চীনের দেশপ্রেমিকদেরও তারই সঙ্গে বিনাশ ঘটবে। হত্যাকারীরা যথেষ্ট অর্থ লুকিয়ে রেখেছে ঠিকই এবং দীর্ঘকাল হয়তো একটি একটি করে বংশধরও জুগিয়ে যাবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যা অবশ্যম্ভাবী তাকে ওরা ঠেকাবে কী করে? "অসংখ্য বংশধর" নিয়ে কোন্ আনন্দটা ওরা করবে? বড়জোর ওদের পৃথিবী থেকে বিলোপ পাবার মুহূর্তটা সাময়িক ভাবে পিছিয়ে যেতে পারে, কিন্তু তখন আবার ওদের এমন একটা বন্ধ্যা দেশে বাস করতে হবে যা মনুষ্য-বসতি স্থাপনের অযোগ্য। ওদের তখন গভীরতম খনির অতলে প্রাণপাত করে খাটতে হবে, ওদের তখন ঘৃণ্যতম পেশা অবধি গ্রহণ করতে হবে…

চীনের বিনাশ যদি রোখা যায় তাহলে প্রাচীন ইতিহাস অনুযায়ী এ-কথাই বলতে হয় যে এই হত্যাকারীদের জন্যে প্রচণ্ড এক চমক্ অপেক্ষা করছে ভবিষ্যতের বুকে।

যা ঘটে গেল তার মধ্যে দিয়েই ঘটনাটি কিন্তু শেষ হয়নি, বরং বলা যেতে পারে এই তো শুরু।

কালি-কলমে লেখা মিথ্যা দিয়ে কখনো রক্তে লেখা সত্যকে ঢাকা দেওয়া যায় না।

রক্তের ঋণ রক্ত দিয়েই শোধ করতে হবে, নচেৎ যত দেরী হবে ততই সুদের পরিমাণ বাড়বে।

এ-সবই অন্তঃসারহীন বকবকানি। কলম দিয়ে যাই লেখা হক না কেন তার মূল্য কতটুকু?

আসল কথাটা হল, বুলেটের ঘায়ে তরুণদের বুক থেকে রক্ত ঝরেছে। যত মিথ্যে কথাই লেখা হক আর যত শোকগাথাই রচনা করা যাক, কোন কিছুই এই রক্তকে ঢাকা দিতে পারবে না। রক্তকে তো আর ঠকানো যায় না, রক্তকে তো আর হত্যা করা যায় না!

১৮ই মার্চ

রিপাবলিকের পত্তন হবার পর

সবচেয়ে আঁধার ছাওয়া দিন।

ফাঁকা কথা

১

আমি কোনদিনই আবেদনপত্র পেশের ব্যাপারটা পছন্দ করতাম না। তার মানে কিন্তু এই নয় যে গত আঠরেই মার্চ যে বীভৎস নরহত্যা ঘটে গেছে সে রকম একটা কিছু ঘটবে বলে আগে থেকেই আমার ভয় ছিল। আমি "বটতলার উকিলের" দৃষ্টিতে আমার চীনা ভাইদের বিচার করি, কিন্তু তা সত্ত্বেও এরকম একটা ঘটনা যে ঘটতে পারে চিন্তাই করতে পারিনি। আমি শুধু এইটুকুই জানতাম যে এই লোকগুলো অনুভূতিহীন, বিবেকহীন, এদের সঙ্গে কথা বলা পর্যন্ত চলে না। তাছাড়া ছাত্রদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল একটি আবেদনপত্র পেশ করা—ওদের হাতে একটি অস্ত্র পর্যন্ত ছিলনা। এরকম প্রতারণা আর পাশবতার কথা ভুলেও সন্দেহ করিনি। একমাত্র তুয়ান চি-জুই, চিয়া তে-ইয়াও, চাঙ শি-চাও আর এদের দলের লোকেরাই বোধহয় কী ঘটতে চলেছে আগে থেকে জানতো। সাতচল্লিশটি তাজা প্রাণ শুধু প্রতারণার দরুণ নষ্ট হল। এদের স্রেফ ছলে-বলে ভুলিয়ে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া হল।

কয়েকটি প্রাণী (প্রাণী না বলে আর কী নামে এদের ডাকা যায় জানি না) এখন বলছে যে জনপ্রিয় নেতারাই নাকি এর জন্যে নৈতিকভাবে দায়ী। এইসব প্রাণীদের মতে নিরস্ত্র জনতাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ার মধ্যে কোন অন্যায় নেই, এদের মতে সরকারী ভবনের সামনের রাস্তাটা "বিপজ্জনক জায়গা" এবং শহীদরা নিজেরাই ফাঁদে পা দিয়েছিল। জনপ্রিয় নেতারা কোনদিনই তুয়ান চি-জুই বা তার মতো লোকের সঙ্গে একমত হয়নি, একসঙ্গে মিলে কোনদিন চক্রান্তও আঁটেন নি। কাজেই এরকম একটা জঘন্য পাশবিক কাণ্ড যে ঘটবে তা আর তাঁরা আগের থেকে বুঝবেন কী করে? যাদের এতটুকু মানবতাবোধ আছে তাদের পক্ষে এ ধরনের পাশবিক অত্যাচারের কথা কখনোই আগে থাকতে কল্পনা করা সম্ভব নয়, একেবারেই সম্ভব নয়।

আমার মনে হয় জনপ্রিয় নেতাদের অভিযোগ করতে হলে তাঁদের দু'টি

মাত্র দোষের কথাই ধরা উচিত। তাঁদের এক নম্বর দোষ—তাঁরা এখনো বিশ্বাস করেন যে আবেদন পেশ করে কিছু ফল পাওয়া যায়। আর দ্বিতীয় দোষ, তাঁরা যাদের বিরুদ্ধে লড়ছেন তাদের সম্বন্ধে বড্ড উঁচু ধারণা পোষণ করেন।

২

সে যাই হোক্ এটা কিন্তু ঘটনা ঘটে যাবার পর বুদ্ধির উদয় হওয়ার ব্যাপার। কিন্তু ঘটনাটা ঘটার আগে কারুর পক্ষে এই করুণ ব্যাপারটা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব ছিল বলে আমার মনে হয় না। বড়জোর হয়তো এইটুকু বলা যেতে পারতো যে এবারেও সব পরিশ্রমই বৃথা যাবে, কাজের কাজ কিছুই হবে না। একমাত্র জ্ঞানী ও বিদ্বান লোকই আগে থেকে ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল, তারা তাই বলেছিল আবেদনপত্র পেশ করা মানেই নিশ্চিত মরণ।

"অলস আলাপ" নামে একটি লেখায় প্রফেসার চেন ইউয়েন লিখেছেন: "আমরা যদি এই বলে দেশপ্রেমিক মহিলাদের উপদেশ দিই যে ভবিষ্যতে গণ-আন্দোলনে তাঁদের পক্ষে খুব একটা সক্রিয় অংশ না নেওয়াই ভাল, তাহলে তাঁরা আমাদের নিশ্চয় এই বলে অভিযোগ করবেন যে আমরা তাঁদের ঘৃণার চোখে দেখি। কাজেই আমরাও আর এ নিয়ে মাথা ঘামাতে ভরসা পাচ্ছি না। সে যাইহোক, এটা কিন্তু আমরা আশা করি যে ভবিষ্যতে আর তরুণ-তরুণীরা কখনো কোন আন্দোলনে যোগ দেবে না। নচেৎ এবারের মতো আবার বুলেটের বৃষ্টি ঝরতে পারে, পায়ের তলায় তারা পিষে যেতে পারে, আহত হওয়া বা মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব নয়।"

তার মানে সাতচল্লিশটা প্রাণের বিনিময়ে এখন আমরা এই জ্ঞানই খরিদ করেছি যে সরকারী ভবনের সামনের রাস্তাটা "বুলেটের বৃষ্টি ঝরা"র জায়গা এবং কেউ যদি নিশ্চিত মরণের মুখে যেতে চায় তার জন্যে তাকে বড় হওয়া অবধি অপেক্ষা করতে হবে, তারপর সে নিজের খুশিমাফিক যা ইচ্ছে করতে পারবে।

আমার মনে হয় আমাদের "দেশপ্রেমিক মহিলা" ও "তরুণ-তরুণীরা" যদি ইস্কুলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগ দেয় তাহলে আর তেমনি মারাত্মক কোন বিপদের আশঙ্কা থাকবে না। আর বুলেটের বৃষ্টি ঝরার কালে আবেদনপত্র পেশ করার প্রসঙ্গটা যদি ওঠে তো বলব যে প্রাপ্তবয়স্ক দেশপ্রেমিক পুরুষদেরও এমন খেয়াল করে বলা উচিত: আর নয়!

আমরা কী ফল পেয়েছি একবার শুধু দেখুন। সর্বসাকুল্যে কয়েকটি শোকগাথা ও প্রবন্ধ, আর গল্পগুজবের মালমশলা। কয়েকজন প্রখ্যাত নাগরিক একটা কবরের জায়গা নিয়ে কয়েকজন প্রখ্যাত কর্তাব্যক্তির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন—একটা গুরুত্বপূর্ণ আবেদন এইভাবেই এখন একটা নগণ্য আবেদন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলাই বাহুল্য যে একটা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াই হবে এই ঘটনাটির সবচেয়ে মানানসই পরিসমাপ্তি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে আমার মনে হচ্ছে সাতচল্লিশজন নিহত মানুষ ইচ্ছাকৃত ভাবেই একটা সরকারী কবরখানায় জায়গা পাবার জন্যে চেষ্টা করেছিল। ওদের বোধহয় ভয় ছিল যে বুড়ো বয়সে মরবার পর কবরের জায়গা অবধি জুটবে না। চিড়িয়াখানাটা খুবই কাছে কিন্তু ওখানে চারজন শহীদের* কবরের ওপর যে ফলকগুলো আছে তাতে কিছু লেখা নেই। এত কাছে থেকেও যখন এই অবস্থা সেই সুদূর "গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদে" কী ঘটবে?

মৃতব্যক্তিরা যদি জীবিতদের হৃদয়ে কবরিত না হয় তাহলে তারা সত্যিই মারা গেছে।

সংস্কার করার ইচ্ছে থাকলে, বলাই বাহুল্য যে রক্তপাত হামেশাই অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। তা বলে রক্তপাত ঘটলেই যে সংস্কার সাধন হবে এমন কোন কথা নেই। রক্তকে অর্থের মতো ব্যবহার করতে হবে, কৃপণতা যেমন ভাল নয় তেমনি অমিতব্যয়িতাও একটি গুরুতর ত্রুটি। এবার যে আত্মত্যাগ দেখেছি তাতে আমি অত্যন্ত ব্যথিত।

আশা করি ভবিষ্যতে আর এ ধরনের আবেদনপত্র পেশের ঘটনা ঘটবে না।

আবেদনপত্র পেশের রীতি সব দেশেই আছে, তার জন্যে কারুর মৃত্যু ঘটে না। আমরা কিন্তু জানি যে চীন এর ব্যতিক্রম, কারণ এখানে বুলেটের বৃষ্টি ঝরে। প্রতিপক্ষ যদি বীর হয় তবেই তার সঙ্গে নিয়মকানুন মেনে লড়াই করা যায়। হান্ রাজত্বের শেষ দিকটাকে নিঃসন্দেহে "অতীতের গৌরবময় দিন" বলে অভিহিত করা যায়, তাই ওই সময়কার একটা গল্প থেকে আমি যদি একটা ঘটনা উদ্ধৃত করি তাহলে বোধহয় কেউ কিছু

* এঁরা ১৯১১-র বিপ্লবের সময় ইউয়ান শি-কাই ও আরেক জন পদস্থ সরকারী কর্মচারীকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল।

মনে করবেন না। চেন চুং কাঁধ না ঢেকে যুদ্ধে গেলে তিনি তীরের আঘাতে বেশ কয়েক জায়গায় আহত হন। চিন শেঙ-তান** তখন তাঁকে লক্ষ্য করে বেশ হেসে জিজ্ঞেস করেন, "কে আপনাকে খোলা কাঁধে যেতে বলেছিল?"

আধুনিক পৃথিবীতে বহুরকমের আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এখন তাই ট্রেঞ্চ কেটে যুদ্ধ করাটাই সাধারণ নিয়ম। তার মানে এই নয় যে আমরা মানব জীবন উৎসর্গ করতে অনিচ্ছুক। আসলে আমরা অকারণে মানুষের জীবন নষ্ট হতে দিতে চাই না, যোদ্ধার জীবনের মূল্য অসীম। তার ওপর যেখানে আবার বেশী যোদ্ধা নেই সেখানে তাদের জীবন আরো মূল্যবান তো হবেই। আমি তা বলে ঈর্ষাজনিত কারণে এদের ঘরের মধ্যে আটকে রাখার প্রস্তাব করছি না। আমরা ন্যূনতম পুঁজি বিনিয়োগ করে সবচেয়ে বেশী লাভ করতে চাই বা নিদেনপক্ষে একটা ভালগোছের প্রতিদান আশা করি। রক্তের বন্যার মধ্যে শত্রুকে চুবিয়ে মারা বা নিজের দেশের লোকের দেহ দিয়ে শূন্যস্থান ভরানোর প্রথা ইতিমধ্যেই সেকেলে হয়ে গেছে। আধুনিক সামরিক বাহিনীর দৃষ্টিভঙ্গীতে এ-সবই কেবল বড়-বড় লোকসান।

মৃতব্যক্তিরা জীবিতদের জন্য সবচেয়ে বড় উপকার করেছে এই সব জীবদের মুখ থেকে মানুষের মুখোশখানা ছিঁড়ে ফেলে, এই সব জীবদের হৃদয়ের চেহারাটি উদ্‌ঘাটন ক'রে দিয়ে। হিংস্রতার এমন আকৃতি মানুষ স্বপ্নেও কোনদিন দেখেনি। এখন যারা লড়াই করছে তারা মৃতব্যক্তিদের কাছ থেকেই লড়াইয়ের নতুন কায়দা শিখেছে।

বিপ্লবের জন্য অবিপ্লবী ব্যগ্রতা

কেউ কেউ বলে যে একটি মহান্‌ বিপ্লবী সামরিক বাহিনীর প্রতিটি সৈনিকের চিন্তাধারা হবে একেবারে সঠিক এবং স্পষ্ট। তা না হলে একে খাঁটি

* 'থ্রি কিঙডমস্‌'-এর কালে ৎসাও ৎসাও-এর অধীনস্থ একজন বিখ্যাত সৈন্যাধ্যক্ষ।

** ১৬০৯—১৬৬৬ সাহিত্য সমালোচক।

বিপ্লবী বাহিনী বলাই চলবে না। এর কানাকড়ি দামও থাকবে না প্রথমটায় কথাগুলোকে যুক্তিযুক্ত ও সুচিন্তিত বলে মনে হয় কিন্তু আসলে এটি একটি অসম্ভব দাবী এবং স্রেফ ফাঁকা বুলি। বিপ্লবকে বিষিয়ে মারার জন্যে এটি একটি চিনি মাখানো বিষাক্ত বড়ি।

ধরা যাক্ সাম্রাজ্যবাদ কবলিত এই দেশের প্রতিটি মানুষকে "দেশ-বিদেশ নির্বিচারে সবাইকে ভালবাসা উচিত" বলে শেখাতে হবে বলে একজন দাবী করল, আর বলল এই শিক্ষা দিলে তবেই দেশের লোক একগাল হেসে জোড়হস্তে মাথা নত করবে এবং "জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে"। এই লোকটির দাবী যতটা অবাস্তব তার চেয়েও বেশী অবাস্তব একটু আগেই যে দাবীর কথা বলেছি। তাই বিপ্লব বিরোধী শত্রুর অধীনে থেকেও শুধু কথা বা কাজের জোরে দেশের তাবৎ নাগরিকের এমন পরিবর্তন ঘটানো যাবে যাতে তাঁরা নির্ভুল ভাবে চিন্তা করতে শিখবেন এমন দাবীর কোন মানেই হয় না। নতুন বিপ্লবী বাহিনীর যোদ্ধারা কেবল একটি ব্যাপারে একমত—স্থিতাবস্থার বিরোধিতা করতে হবে। এঁদের শেষ লক্ষ্য কিন্তু সত্যিই জনে জনে বিভিন্ন। কেউ লড়াই করছেন সমাজের জন্য, কেউ একটা গোষ্ঠির জন্য, কেউ একটি মহিলার জন্য, কেউ নিজের জন্য বা স্রেফ আত্মহত্যা করবার একটা সুযোগ পাবার জন্য। তা সত্ত্বেও বিপ্লবী বাহিনী কিন্তু ঠিক এগিয়ে চলেছে। কারণ এই যুদ্ধে একজন সমষ্টিক্ প্রচেষ্টায় বিশ্বাসীর গুলিতেও যেমন শত্রু মরবে ঠিক তেমনি মরবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসীর গুলিতেও। তাছাড়া যে-ধরনের যোদ্ধাই যুদ্ধে মারা যাক্ বা আহত হক, বিপ্লবী বাহিনীর সামরিক শক্তি সমপরিমাণ হ্রাস পাবে। অবশ্য এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সবার শেষ উদ্দেশ্য এক নয় বলেই যুদ্ধের সময়েই অনেকে সরে পড়ে, পালিয়ে যায়, অবক্ষয়ের গ্রাস হয় বা দলত্যাগ করে শত্রুপক্ষে যোগ দেয়। কিন্তু বিপ্লবী বাহিনীর অগ্রগতি যদি বজায় থাকে তাহলে যত দিন যাবে তাদের বাহিনীর পাঁচমিশেলী ভাব ততই কমবে ও তাদের দক্ষতা তত বাড়বে।

'মাত্র দশ বছর' নামে ইয়ে ইয়ুও-চেন রচিত উপন্যাসটির ভূমিকা লেখার সময় আমার মনে হয়েছিল যে কোন মানুষ যদি নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী সত্যি সত্যিই সমাজের উপকার করবে বলে ঠিক করে তাহলে এমনিই হয়। এই উপন্যাসের নায়ক যুদ্ধক্ষেত্রে গেছল ও পাহারাদারের কাজ নিয়েছিল (ওকে কিন্তু কেউ কখনো বন্দুক ছুড়তে শেখায়নি)। কাজেই একথা বলা

চলে যে এই লোকটির বাস্তববুদ্ধি সেইসব বিদ্বান ব্যক্তিদের চেয়ে অনেক বেশী, যারা শুধু হাঁটু জড়িয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদতে জানে বা শুধু রাগের কথা কাগজে লিপিবদ্ধ করতে পারে। যোদ্ধাদের প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক হবে এবং তাঁরা প্রত্যেকে ইস্পাতের মতো দৃঢ় হবেন বলে জোর ধরাটা একটা অত্যন্ত অযৌক্তিক ও অবাস্তব স্বপ্ন।

পরে কিন্তু আমি 'শান পাও'-তে এর চেয়েও তীব্র ও আরো প্রগতিবাদী একটি সমালোচনা পড়েছি। নায়ক ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিপ্লবে যোগদান করেছিল বলে এখানে গভীর অসন্তোষ ব্যক্ত হয়েছে। এখন শান পাও পুরোপুরি ভাবে শান্তির পক্ষে এবং বিপ্লবের ঘোর বিরোধী বলে প্রথম দৃষ্টিতে ওদের এই সমালোচনা অত্যন্ত বেখাপ্পা বলে মনে হয়। তবে আমায় যদি সুযোগ দেন আমি বুঝিয়ে দিতে পারি যে কি ক'রে একজন বাস্তব চরমপন্থী বিপ্লবী (আসলে একজন অত্যন্ত অবিপ্লবী বা প্রতিবিপ্লবী ও আত্মকেন্দ্রিক ভাষ্যকার) এ ধরনের সমালোচনাকে এ জাতীয় কাগজের উপযোগী করে তোলেন।

এদের একটা টাইপ্ হচ্ছে অবক্ষয়ী। কোন বিশেষ আদর্শ বা সামর্থ্য না থাকার জন্যে ইনি অবিরাম তাৎক্ষণিক আমোদের সন্ধানে হাঁবপাক করে বেড়ান। তারপর শীঘ্রই যখন ফুর্তি করার চালু পদ্ধতিগুলো তাঁর কাছে বিরক্তিকর হয়ে ওঠে, তিনি তখন বাধ্য হয়ে নতুন উত্তেজনার সন্ধান করতে থাকেন। একমাত্র চরম অনুভূতিগুলোকেই তিনি উপভোগ করতে পারেন। বিপ্লব তাঁর কাছে একটা নতুন উত্তেজনা। এ ঠিক সেই পেটুকের মতো ব্যাপার। যার খিদে মরে গেছে, স্বাদ নেবার ক্ষমতা নেই, যাকে আধবাটি ভাত গলাধঃকরণ করতে হলেও তার আগে যথেষ্ট পরিমাণ লঙ্কা আর মরিচ খেয়ে খানিকটা ঘেমে নিতে হয়। ইনি একেবারে আগাপাস্তালা বিপ্লবী লেখা চান। তাই যে মুহূর্তে যুগের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি উদ্‌ঘাটিত হয় উনি ভ্রুকুটি করেন আর ভাবেন যে এটার তৃণাদপি মূল্যও নেই। কেউ সত্যভ্রষ্ট হলেও উনি যতক্ষণ তার থেকে আনন্দ লাভ করছেন ততক্ষণ কিছু মনে করবেন না। সবাই বদলেয়ারের কথা জানেন। এই অবক্ষয়ী ফরাসী কবি বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, কিন্তু যে মুহূর্তে বিপ্লব তাঁর অবক্ষয়ী জীবনযাত্রার ওপর হস্তক্ষেপ করবে বলে শাসানি দিল অমনি তিনি বিপ্লবকে ঘৃণা করতে শুরু করলেন। তাই দেখা যায় যে বিপ্লব সংঘটিত হবার পূর্বঅধ্যায়ের কাগজ-

কল্পের বিপ্লবীরা, অর্থাৎ একেবারে পুরোমাত্রার অতি উৎসাহী বিপ্লবীরা বিপ্লব এগিয়ে এলেই নিজেদের মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে। এই মুখোশগুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তারা নিজেরাও সচেতন নয়। এইসব নজিরের কথা চেঙ্ ফাঙ উ'র মতো সেইসব "বিপ্লবী লেখকদের" জানানো উচিত যারা সামান্য একটু অসাফল্য দেখা মাত্রই পদমর্যাদা (বা টাকার) তেমন জোর থাকলে সোজা পূব দিকে টোকিওয় যাত্রা করে বা পশ্চিমে প্যারিতে পালায়।

এদের আরেকটা টাইপ্-কে গোত্রভুক্ত করা শক্ত। এদের আসল ব্যাপার এই যে এদের কোন দৃষ্টিভঙ্গিই নেই। এরা তাই সর্বদাই অন্যদের ভ্রান্ত বলে মনে করে আর নিজেদের সঠিক বলে ভাবে। শেষ বিচারে এরাই স্থিতাবস্থায় সবচেয়ে তৃপ্তি পায়। সমালোচক হিসেবে কিছু বলবার সময় এরা যা পায় তাই ধ'রে অপর পক্ষকে চুপ করিয়ে দিতে চায়। কখনো এরা পারস্পরিক সাহায্যের তত্ত্বকে খণ্ডন করার জন্যে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের কথা পাড়ে আবার কখনো ঠিক এর উল্টোটা ঘোষণা করে। শান্তির প্রস্তাবের বিরোধিতা করার জন্যে এরা শ্রেণী সংগ্রাম প্রচার করে আর শ্রেণী সংগ্রামকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে শ্রেণী নির্বিচারে বিশ্ব প্রেমের গুণ গায়। একজন ভাববাদীর সঙ্গে তর্ক-করার সময় এরা বস্তুবাদীর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে কিন্তু বস্তুবাদীর যুক্তি খণ্ডন করবার সময় এরা ভাববাদী হয়ে ওঠে। এক কথায় এরা ইংরেজী স্কেল দিয়ে রুশ 'ভার্স্ট্' মাপে আর ফরাসী স্কেল দিয়ে ইংরেজী 'ইঞ্চ'। ফলত দেখা যায় যে কারুরই মান ঠিক নেই। এখন কারুরই যখন মান ঠিক নেই এরা নিশ্চয় নিজেদের মহা মূল্যবান মধ্যপন্থার একমাত্র প্রচারক বলে ধরে নিতে পারে এবং চিরকাল আত্মতুষ্ট হয়ে থাকতে পারে! এদের মতে যার মধ্যে একটু কিছু ত্রুটি আছে সেটা মূল্যহীন। আজকের এই পৃথিবীটা কিন্তু একশো ভাগ খাঁটি নয়, তাই এদিক থেকে সবচেয়ে নিরাপদ হচ্ছে চুপ্‌টি মেরে বসে থাকা। চুপ্‌টি মেরে বসে থাকাও কিন্তু একটা বিরাট ভুল। সংক্ষেপে, এ জগতে জীবন যাত্রা নির্বাহ করাটা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে, আর বিপ্লবী হওয়াটাও তাই স্বাভাবিক ভাবেই আরো শক্ত কাজ।

'মাত্র দশ বছরের' নায়ক আগাগোড়া বিপ্লবী না হওয়ার জন্যে 'শান পাও' সমালোচনা করেছে বটে কিন্তু এই কাগজটিই আবার সমাজ বিজ্ঞানের ওপর বিভিন্ন রচনার অনুবাদকদের লক্ষ্য করে চোখাচোখা গালি ছুঁড়েছে।

কাজেই বক্তব্যের দিক থেকে এই কাগজটি ওই পূর্বোল্লিখিত দ্বিতীয় টাইপের মধ্যে পড়ে। অবশ্য তার সঙ্গে আবার ঈষৎ মিশ্রণ ঘটেছে অবক্ষয়ীদের জগত-ক্লান্তির। তাই খিদে মেটাবার জন্যে এত লম্বা খাবার ঝোঁক!

বুদ্ধির জোরে জীবনধারণ

সাংহাইয়ের ভাষায় যাকে "চালিয়ে যাওয়া" বলে চলতি চীনাভাষায় তাকে "নিষ্কর্মার মতো ঘোরা" বলে অনুবাদ করতে হয়। আর "বুদ্ধির জোরে জীবনধারণ" কথাটার মানে বিদেশীদের পক্ষে বোঝা সহজ হবে যদি এর বদলে সেই প্রাচীন বাগধারা অনুযায়ী বলা যায় যে "নিষ্কর্মার যা জোটে তাই লাভ"।

কী আশ্চর্য যে নিষ্কর্মার মতো ঘোরাটাও জীবনধারণের একটি উপায়! অথচ সাংহাইয়ের কোন লোককে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তাঁর জীবিকা কি বা কোন মহিলাকে যদি তাঁর স্বামী কি করেন বলে কেউ প্রশ্ন করে তো তাঁদের হয়তো সরাসরি বলতে শোনা যাবে যে তাঁরা বুদ্ধিজীবী।

যে ভদ্রলোক প্রশ্নটা করেন তিনিও কিন্তু এই উত্তরে বিস্মিত হন না। অন্তত উত্তর হিসেবে "শিক্ষকতা" বা "কারখানার কাজ" শুনলে যতটা হতেন তার বেশী নয়। অবশ্য "কাজ নেই" এই উত্তর পেলে তিনি নিশ্চয় উদ্বিগ্ন বোধ করতে শুরু করবেন।

সাংহাইয়ে নিজের বুদ্ধির জোরে জীবনধারণ করাকে বেশ মান্য করা হয়!

সাংহাইয়ের খবরের কাগজ পড়লে দেখা যায় যে এদের লোক ঠকানোর সংবাদেই তার প্রায় সবটুকু ঠাসা। এসব না থাকলে স্থানীয় সংবাদের আকর্ষণ কমে যাবে। বুদ্ধিজীবীরা কত যে টাকা লোটে তার ঠিক নেই কিন্তু তবু শেষ বিচারে দেখা যায় যে এদের হাতে আছে মাত্র তিনটি কৌশল। কিন্তু এই তিনটেকে আমরা যে অসংখ্য বলে ভুল করি তার কারণ সব কটা কৌশল এরা কখনো একসঙ্গে প্রয়োগ করে না।

এদের এক নম্বর কৌশল প্রতারণা। যারা লোভী তাদের প্রলুব্ধ

করো, যাদের কোন অভিযোগ রয়েছে তাদের জন্যে দুঃখিত হবার ভান করো, যাদের সময় খুব খারাপ যাচ্ছে তাদের প্রতি উদারতা দেখাও আর উদার ব্যক্তিদের কাছে ভাগ্যের নির্মম পরিহাস নিয়ে কাহিনী ফেঁদে বসো। এইভাবে অন্যের কাছ থেকে টাকা গেঁড়িয়ে দিতে পারবে।

দ্বিতীয় কৌশল ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়। প্রতারণায় যদি কাজ না হয় বা সেটা ধরা পড়ে যায় তো ক্রুদ্ধ হবার ভান করো, শুরু করো ভয় দেখাতে। হয় লোকটা তোমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছে বলে দাবী করো আর নয়তো কোন কারণই দেখিয়ো না। এসবই "আলোচনা চালানো"-র মধ্যে পড়ে! এইভাবে তার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে পারো।

তৃতীয় কৌশল—সরে পড়া। উল্লিখিত কৌশল দুটোর মধ্যে যে কোন একটা বা দু'টোকেই যখন কার্যকরী হতে দেখবে তখন আর পিছনে কোন চিহ্ন না রেখে স্রেফ হাওয়া হয়ে যাও। আর যদি বা কাজ হাসিল না হয় সে ক্ষেত্রেও পিছনে কোন নিদর্শন না রেখে সরে পড়ো। ঘটনাটা গুরুতর রকমের কিছু হলে সেই অঞ্চল ছেড়ে পালাও। যতদিন না গণ্ডগোল মিটছে গা ঢাকা দিয়ে থাকো।

এ ধরনের একটা বৃত্তির অস্তিত্ব আছে বলে সবাই জানে কিন্তু তার জন্যে কেউই মর্মাহত নয়।

মানুষের পক্ষে যখন বুদ্ধির জোরে জীবনধারণ করা সম্ভব, যারা কাজ করছে তারা তো অনাহারে থাকবেই। একথা প্রত্যেকেই জানে কিন্তু কেউই মর্মাহত হচ্ছে না।

যারা বুদ্ধির জোরে জীবনধারণ করছে তাদের কিন্তু কিছু প্রশংসনীয় গুণ আছে--এরা একেবারে খোলাখুলি ভাবেই স্বীকার করে যে নিজেরা "বুদ্ধির জোরে জীবনধারণ করছে।"

উচ্চারোহণ ও ছুটে চলা

প্রফেসার লিয়াঙ শি-চিউ একবার এই মর্মে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন যে গরিবরা সর্বদাই উঁচুতে উঠতে চায়, যতক্ষণ না তারা ধনী হতে পারছে

কেবলই উঁচু থেকে আরো উঁচুতে উঠতে চায়। শুধু গরিব কেন ক্রীতদাসেরাও আরোহণকারী। সুযোগ এলে এরা নিজেদের অমর বলে মনে করে। জানা কথাই যে সেই জন্যেই জগতে এখনো শান্তি বিরাজ করছে।

খুব অল্প লোকেই একেবারে চুড়োয় গিয়ে উঠতে পারে কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যেকেই ভাবে যে সে নিজে ঠিক সফলতা লাভ করবে। সেই জন্যেই অতি স্বাভাবিক ভাবেই তারা যে যেমনটি আছে সেই লাঙলবাহী, কৃষক, গোবর-কুড়িয়ে বা গরিব শিক্ষক হিসেবেই সন্তুষ্ট চিত্তে বাস করে যায়। এই পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী ব্যক্তিরা ভাগ্যের শোচনীয়তাকে বোঝার মত বইতে বইতে প্রকৃতির সঙ্গে যুঝে চলে আর ওপরে উঠতে থাকে। যতদূর সাধ্য ওপরে ওঠবার চেষ্টা করে। উচ্চারোহণকারীদের সংখ্যা কিন্তু এত বেশী যে ওপরে ওঠার একমাত্র পথটি ভয়াবহ ভাবে জনাকীর্ণ হয়ে আছে। সরল প্রাণ যেসব মানুষ নিয়মানুযায়ী আরোহণ করে তারা কচিৎ চুড়োয় পৌছয়। যেসব বুদ্ধিমান ব্যক্তির দক্ষতা আছে তারা এদের আশেপাশে বা নীচে ঠেলে সরিয়ে দেয়, পায়ে করে পিষে দেয় ও এদের কাঁধে বা মাথার ওপর চড়ে দাঁড়ায়। বেশীর ভাগ লোকেই সাত-পাঁচ না ভেবেই আরোহণ করে চলে, তাদের এই বলে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে তাদের শত্রুরাও তাদের পাশেই আছে, চুড়োয় বসে নেই। এরা ভাবে যে এদের শত্রুরা ওদের সঙ্গেই আরোহণ করার চেষ্টা করছে। হাতে-পায়ে ভর রেখে ধাপে ধাপে ওপরে ওঠার জন্যে এরা যখন যোঝে তখন দেখা যায় এদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকেই সব দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে নিচ্ছে। অথচ এই প্রচেষ্টার পরিণতি কিন্তু সেই ঠেলা খেয়ে আবার পিছিয়ে আসা। এর পরেও ওরা কিন্তু ফের উচ্চারোহণের চেষ্টা করবে, একবারও বিশ্রাম নিতে থামবে না।

তবে কিনা উচ্চারোহীর সংখ্যা এত বেশী আর এত কম লোকে চুড়োয় পৌছয় যে ভাল মানুষেরা ক্রমশ আশা হারায়। শেষ পর্যন্ত তাই একটা নিষ্ক্রিয় বিদ্রোহ দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকে। ঠিক এই কারণেই উচ্চারোহণ ছাড়া ধাক্কা মেরে ছুটে চলাটাও আবিষ্কৃত হয়েছে।

এ ঘটনাটা তখনই ঘটে যখন কেউ জানতে পারে যে তার জীবনটা অতি কষ্টের এবং সে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। যেই কেউ

এ-চেষ্টা করে সঙ্গে সঙ্গে তার পিছন দিকে হল্লা ওঠে: "ধাক্কা মেরে ছুটে চলো হে!" লোকটার অসাড় পা দুটোর কাঁপুনি বন্ধ হবার আগেই কেউ না কেউ তাকে ধাক্কা মেরে পিছনে ফেলে ছুটে চলে যায়। উচ্চারোহণের চেয়ে এ কাজটা অনেক সোজা কারণ এর জন্যে কাউকে হাত বা হাঁটু ব্যবহার করতে হয় না। স্রেফ শরীরটাকে একটু সম্মুখপানে নত করে ছুটে এগিয়ে গেলেই হল। কেউ যদি ঠিক মতো ধাক্কা মেরে এগিয়ে যেতে পারে তাহলে সে পাঁচলক্ষ ডলার পাবে, পত্নী জুটবে, সম্পদ আহরণ করবে, ছেলেপুলে হবে আর পদমর্যাদা লাভ করবে। কেউ যদি ভালভাবে কাজটা সারতে না পারে তাতেও অসুবিধা নেই। বড় জোর মাটির ওপর একটা আছাড় খেতে হবে। আছাড় খেলেও কিছু যায় আসে না, কারণ, প্রথমে তো লোকটি এই মাটির ওপরেই ছিল। এখন সে আবার না হয় উচ্চারোহণ শুরু করবে। তাছাড়া কিছু কিছু লোক শুধু মজা করার জন্যেই ধাক্কা মেরে ছুটে চলে, পতনের আশঙ্কায় তারা ভীত নয়।

একজন অতি বিনীত বিদ্যার্থীর রাজপ্রাসাদের পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকার করা বা পুরুষ বেশ্যা থেকে দালাল পুঁজিপতিতে পরিণত হওয়া—সব ক্ষেত্রেই উচ্চারোহণের প্রথাটি সাবেক কাল থেকেই সম্মানজনক বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। ধাক্কা মেরে ছুটে চলাটাকে কিন্তু আধুনিক আবিষ্কার বলে মনে হয়। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখলে আমরা দেখব যে এর সঙ্গে বোধহয় অতীতকালের একটা মাত্র ঘটনাটার কিছু মিল আছে। সেই যখন "তরুণীটি একটি রেশমের বল ছুঁড়ে ছিলেন"।* এই তরুণীটি রেশমের বলটি ছোঁড়বার উদ্যোগ করা মাত্র ওনার পাণিপ্রার্থী সব হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তিরাই হাঁ করে ওপর দিকে মুখ করেন, তাদের মুখ দিয়ে নাল গড়াতে শুরু করে। দুর্ভাগ্যবশত প্রাচীনকালের লোকে এত বোকা হত যে তারা মুদ্রার রঙটা কি রকম সেটা দেখবার জন্যে পেড়াপিড়ি করত না। তা না হলে ওরা নিশ্চয় লক্ষ লক্ষ মুদ্রার মধ্যে গড়াগড়ি দিতে পারত।

* জনপ্রিয় লোক কথায় আছে এক ধনী কন্যা একটি রেশমের বল রাস্তায় ছুঁড়ে দিয়েছিল। যে ব্যক্তি প্রথম এটি লুফতে পারবে তাকেই সে বিয়ে করবে বলে ঘোষণা করেছিল।

উচ্চারোহণকারীরা যত কম সুযোগ পায় মানুষ ততই ধাক্কা মেরে ছুটে যেতে চেষ্টা করে। তাছাড়া উচ্চাপদাসীন ব্যক্তিরা প্রতিদিনই এদের সুযোগ করে দেয়, একটু চেষ্টা ক'রে দেখতে বলে, আর প্রতিশ্রুতি দেয় যে এর ফলে এরা নাকি সুখ্যাতি লাভ করবে, লাভবান হবে এবং অমর মানুষদের মতো জীবন যাপন করতে পারবে। এই জন্যেই দেখা যায় যে চুড়োয় আরোহণ করার চেয়ে ধাক্কা মেরে ছুটে সাফল্য লাভ করার সুযোগ যদিও আরো কম, তবু সবাই নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করতে চায়। উচ্চারোহণের পর এরা ধাক্কা মেরে ছোটে, আর ধাক্কা মেরে ছুটে যদি সফল না হয় তখন আবার উচ্চারোহণের চেষ্টা শুরু করে ...আর এই ভাবেই আমৃত্যুকাল তারা এই চালিয়ে যায়।

নারীমুক্তি প্রসঙ্গে

কনফুসিয়াস বলেছিলেন, "মহিলা ও নীচশ্রেণীর লোকেদেরই শুধু কর্তৃত্বাধীনে রাখা কঠিন। বেশী প্রশ্রয় দিলে এরা আর একটুও শ্রদ্ধা দেখায় না। ওদিকে আবার দূরে দূরে রাখলে বিরূপ হয়ে ওঠে।"* এখানে মহিলা ও নীচশ্রেণীর মানুষদের উনি একজোট বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু চিন্তার কথা এই যে, উনি নিজের মাকেও কি এই দলভুক্ত করেছিলেন? পরবর্তীকালের গোঁড়া কনফুসীয়পন্থীরা কিন্তু নিজেদের মাকে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন—নিদেন পক্ষে সেটা লোক-দেখানো গোছের ছিল। সে যাই হোক চীনের যেসব মহিলা মাতৃপদভুক্ত তাঁরা কিন্তু একমাত্র নিজেদের ছেলে ছাড়া আর সবার চোখেই খুব হেয়।

১৯১১ সালের বিপ্লবের পর খ্যাতনাম্নী মিস্ শেন্ পাই চেন** নিজের

* 'অ্যানালেক্টস্' থেকে উদ্ধৃত।

** 'হাঙ চাউ'-এর বাসিন্দা। ১৯১১-র বিপ্লবে 'অগ্রগামী উত্তর নারী বাহিনী' সংগঠিত করেন। পরবর্তীকালে ইউয়ান শি-কাই'য়ের উপদেষ্টাদের একজন বলে গণ্য হন।

রাজনৈতিক ক্ষমতাটুকুর সদব্যবহার করতে পার্লামেন্টের প্রবেশ পথে একজন রক্ষীকে লাথি মেরে ফেলে দেন। আমার নিজস্ব ধারণা এবং অনেকেই সন্দেহ করেন যে লোকটা নিজেই পড়ে গেছল। তবে একথা ঠিক যে আমাদের মত কোন পুরুষ যদি তাকে লাথি মারতো তো সে নিশ্চয় বদলা হিসেবে বেশ কয়েকবার লাথি মেরে নিত। মেয়ে হয়ে জন্মানোর এটা একটা দারুণ সুবিধা তো বটেই! আজকাল বিবাহিতা মহিলাদের মধ্যে অনেকেই ইচ্ছে করলে নামী ব্যক্তিদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে পারেন, বন্দরে বা সভাস্থলে তাঁদের ফটোও ওঠে। তাছাড়া কোন জাহাজ বা এরোপ্লেনের প্রথম পাড়ি শুরু হবার আগে অনেক মহিলাই সেটির সামনে এসে দাঁড়ান, তারপর একটা মদের বোতল তার গায়ে ঠুকে ভাঙেন (এটিতে অবশ্য অবিবাহিতাদের একচেটিয়া অধিকার থাকা সম্ভব। এ সম্বন্ধে কোন বিশদ বর্ণনা শুনিনি)। মেয়ে হয়ে জন্মানোর এও আরেকটা বিশেষ লাভ। এসব ছাড়াও জীবিকা অর্জনের আরো নানা পথ আছে। আমি কারখানার কাজে যাঁরা যোগ দেন তাঁদের কথা বলছি না। এঁদের কাজে ঢোকাতে পারলে মালিকরা যে খুশী হয় তার কারণ মাইনে কম দিতে হয়, আর যা বলা হয় তাই তাঁরা করেন। এই দৃষ্টান্তটি বাদ দিলে অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদের দেখছি 'ফুলদানী' বলে নাম দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তবু এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না যে তাঁরা মহিলা বলেই এই ধরনের নানা সগৌরব বিজ্ঞাপন চোখে পডছে যাতে ঘোষিত হয়েছে—"এখানকার সব কাজকর্ম মহিলারাই করেন"। কোন পুরুষ যদি অকস্মাৎ এবংবিধ উচ্চপদমর্যাদার অভিলাষী হয়ে পড়েন তো শুধু পুংলিঙ্গের ওপর ভরসা রাখলে ফল হবে না, নিদেনপক্ষে তাকে কুকুরের সামিল তো হতেই হবে।

৪ঠা মে'র পর থেকে নারীমুক্তি প্রকল্প বাস্তবে প্রয়োগ করার যে চেষ্টা চালানো হয়েছিল বর্তমানে তা থেকে আমরা পূর্বোক্ত ফলাফল লাভ করেছি। এখন কিন্তু কার্যরতা অনেক মহিলাকে করুণ বিলাপ করতে শোনা যাচ্ছে এবং সমালোচকরাও নব্য মহিলাদের ব্যঙ্গ করতে ছাড়ছেন না। নিজেদের বসার ঘর ছেড়ে সমাজে তাঁদের এই প্রথম পদক্ষেপ নতুন মাল-মশলা জুগিয়েছে ঠাট্টা তামাশা আর তর্কের।

এর কারণ সমাজে মহিলারা আজো অন্য লোকের "কর্তৃত্বাধীনে"।

আপনি যদি অন্য কারুর "কর্তৃত্বাধীনে" থাকেন তাহলে তাদের এই গালি-গালাজ মেনে নিতে হবেই। আমরা আগেই দেখেছি কনফুসিয়াস কী ভাবে অভিযোগ করেছিলেন। এও জেনেছি কাজটা তাঁর কাছে কঠিন ঠেকেছিল, কারণ কিছু সংখ্যক মহিলাকে তাঁকে "কর্তৃত্বাধীনে" রাখতে হয়েছিল। এই জন্যেই কী "খুব প্রশ্রয় দেওয়া" কী "দূরে দূরে রাখা", কোনটাই তিনি সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করতে পারেননি। আজকালকার সব ছেলে ও বিবাহিত ব্যক্তিদেরও এই একই অভিযোগ। মহিলাদেরও মনস্তাপ এখানেই। 'সংরক্ষক' ও 'সংরক্ষিত'দের এই তফাতটা যতদিন না ঘুচছে এইসব অভিযোগ বা মনস্তাপের কোন সুরাহা হবে না।

বর্তমানের সংস্কারহীন সমাজে প্রতিটি কেতা স্রেফ জানলার বাহার-বাড়ানো ব'ই কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে এখনো অবধি কিছুই বদলায়নি। বহুদিন ধরে খাঁচায় বন্দী একটা ছোট্ট পাখীকে যদি দাঁড়ে বসতে দেওয়া হয় তাহলে আপাত-দৃষ্টিতে তার পদমর্যাদার পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয়। আসলে কিন্তু সে সেই পুরুষের হাতের খেলনাই রয়ে গেছে। এর পান দংশন ভক্ষণ সবই অন্যলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে। একটা প্রবাদ আছে তাতেও এই কথাই বলে: "কারুর কাছ থেকে অন্ন গ্রহণ করলে তার আদেশও মান্য করতে হবে।" তাই আমার ধারণা যতদিন না মহিলারা পুরুষদের সমান অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছেন ততদিন যতই সুশ্রাব্য খেতাব প্রয়োগ করা হক না কেন তা বৃথা! এটা ঠিক যে নারী পুরুষের মধ্যে কিছু শারীরিক ও মানসিক বৈষম্য আছে। কিন্তু সে বৈষম্য তো স্ত্রী বা পুরুষ জাতির নিজ নিজ সদস্যদের মধ্যেও আছে। কথা হচ্ছে নারী ও পুরুষের সামাজিক পদমর্যাদা এক হতে হবে। নারী ও পুরুষের সামাজিক পদমর্যাদা সমান হবার পরে সত্যিকার পুরুষ ও সত্যিকার নারীদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হবে, তাদের অভিযোগ ও মনস্তাপ দূর হবে।

প্রকৃত মুক্তি আসতে পারে লড়াইয়ের পর। তার মানে আমার বক্তব্য এই নয় যে মহিলারা পুরুষদের মতোই অস্ত্র হাতে নেবে বা ছেলেদের শুধু বুকের একদিক থেকে স্তন্যপান করাবে আর বাকি দায়িত্বটুকু পুরুষের বলে ছেড়ে দেবে। আমি খালি এই বলতে চাই যে বর্তমানে আমরা যা পেয়েছি তাই নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গা এলিয়ে দেব না, একটানা সংগ্রাম চালিয়ে যাব মুক্তির জন্যে—আদর্শগত ও অর্থনৈতিক মুক্তি পেতে। সমাজের মুক্তি সাধন হলে

ব্যক্তিরও তাই হবে। অবশ্য আজকের দিনে যেসব শৃঙ্খলে একমাত্র মহিলারাই কেবল আটকা পড়ে রয়েছেন তার বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হবে।

আগুন

মানুষের কাজে লাগবে বলে আগুন চুরি করে আনার পর প্রমিথিউসকে স্বর্গের আইন ভঙ্গ করার দায়ে নরকে যেতে হয়েছিল। কিন্তু সুই-জেন-শী* কাঠে কাঠে ঘসে আগুন জ্বালতে সক্ষম হলে তাঁকে অন্তত চৌর্যবৃত্তির জন্য বা পবিত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধ্বংস করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি। তখনো পর্যন্ত গাছ কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে গণ্য হত না। সে যাই হোক সুই-জেন-শী'কে লোকে এখন ভুলে গেছে। আজকাল আর তিনি পূজা পান না। এখন দেখি চীনের জনগণ শুধু অগ্নি-দেবতার পূজা করছে।

অগ্নিদেব সোজাসুজি আগুন ধরিয়েই খালাস, আলোর ব্যাপারে তাঁর কিছুই করার নেই। আসলে প্রতিটি অগ্নিকাণ্ডের মধ্যেই তাঁর একটা বিশেষ ভূমিকা আছে বলে মানুষ তাঁকে পূজা করে চলেছে। লোকে হয়তো আশা করে যে পূজা করলে উনি ওনার অনিষ্টের বহর কিছুটা কমাবেন। কিন্তু উনি যদি কোন অনিষ্টই না করতেন তাহলে তো পুজো পাওয়াটাই বন্ধ হয়ে যেত! তাই নয় কী?

আলো জ্বালানো কাজটা বড়ই সাদাসিধে। সেই প্রাচীন কালে সুই-জেন-শী'র কাছ থেকে আগুন জ্বালানো শেখার পর প্রায় পাঁচ ছ' হাজার বছর পেরিয়ে গেছে। তা বলে কিন্তু ইতিমধ্যে কোন খ্যাতনামা পুরুষই আলো জ্বালিয়ে সম্মান লাভ করেননি। আগুন ধরানোটা স্বতন্ত্র প্রস্তাব। 'চিন্'-এর প্রথম সম্রাট যেটা ধরিয়েছিলেন সেটা বই পুড়োতে। মানুষ নয়। পাশ্-এ প্রবেশ করার সময় শিয়াঙ ইউ আরেকটা ধরিয়েছিলেন নোফাঙ প্রাসাদ পুড়োতে। জনসাধারণের বাসগৃহ পুড়োতে নয় (?—বিষয়টি অনুসন্ধান

* পৌরাণিক কিংবদন্তীর এক রাজা। বলা হয় ইনি আগুন আবিষ্কার করেছিলেন।

সাপেক্ষ)। একজন রোমান সম্রাট সাধারণ মানুষকে পুড়োতে আগুন ধরিয়েছিলেন এবং মধ্যযুগে গোঁড়া খৃষ্টান গির্জার পাদ্রীরা ধর্মীয় অনুশাসন ভঙ্গের জন্য অনেককে এক-এক আঁটি কাঠের মতো পুড়িয়ে মেরেছেন, কখনো বা তাদের ওপর তেলও ঢেলেছেন। এঁরা সবাই নিজের নিজের কালের বীর। এ যুগের হিটলারই তার জীবন্ত প্রমাণ। নিশ্চয়—এমন সব বীরদের পুজো না দিলে চলে! বিশেষতঃ এখন আবার বিবর্তনের যুগ, নতুন যুগের নতুন মানুষদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিদেবও যে নিত্য নতুন ক্ষমতা কুক্ষিগত করে চলেছেন সে কথা খেয়াল রাখতে হবে বই কী!

যেসব জায়গায় বৈদ্যুতিক আলো নেই লোকে একটু-আধটু প্যারাফিন কিনেছিল সন্ধ্যেবেলায় আলো জ্বালবে বলে। এ বছর যে আমাদের শুধু দিশী জিনিষ কেনার কথা সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি। কিন্তু ওই যে জানলার কাগজের ওপর ম্লান হলদে রশ্মিটি দেখা যাচ্ছে ওটা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর! নাঃ—এ ধরনের আলো দিয়ে আমাদের কাজ চলবে না। সত্যিই যদি আমরা আলো চাই তো প্যারাফিনের এই অপচয় রোধ করার জন্যে প্যারাফিন ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করতে হবে। তারপর যত প্যারাফিন আছে বয়ে নিয়ে যেতে হবে প্রান্তরে, সাঁজোয়া গাড়ির মধ্যে ঢেলে দিতে হবে। তারপর সাঁজোয়া গাড়ি যেই সেগুলোকে উগ্‌রে ফেলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেবে অমনি ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড ঘটবে। চারধারে ডজন ডজন মাইল জুড়ে যা-আছে সব জ্বলবে—গাছপালা শস্য বাড়িঘর এবং বিশেষ করে খড়-ছাওয়া কুঁড়ে ঘরগুলো। মুহূর্তের মধ্যে সব ছাই হয়ে যাবে আর চারপাশ জুড়ে সেই ছাই উড়বে। এতেও যদিও না হয় তো আগুন ধরানো বোমা আছে, গন্ধকের বোমা আছে। এগুলোকে আকাশ থেকেই ফেলে দেওয়া যাবে। দিনে রাতে মিলিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বলবে। ২৮শে জানুয়ারী সাংহাইয়ে যে বিপুল অগ্নিকাণ্ডের সূচনা হয়েছিল ঠিক তেমনি আবার দেখতে পাওয়া যাবে। তা হ্যাঁ—সেদিন সত্যিই আলোর মতো আলো দেখতে পাওয়া গেছল।

অগ্নিদেবের ক্ষমতার কম্‌তি না থাকলে কী হবে এসব কথা উনি কিন্তু স্বীকার করেন না। অনেকে বলে ওনার কাজ দরিদ্র মানুষকে রক্ষা করা। অথচ যেই কোথাও আগুন লাগে গরীবদেরই এর জন্যে দায়ী করা হয়। এই সুযোগে ঘর ভেঙে ঢুকে চুরি করাটাই নাকি তাদের মতলব।

'কে জানে কী ব্যাপার!'—এই কথাটাই যুগ যুগ ধরে বলে আসছেন বিখ্যাত

সব আগুন ধরিয়ে বোমারা। তা বলে লোকে যে সবসময় তাদের বিশ্বাস করেছে তা নয়।

এটা আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে আলো জ্বালানো কাজটা সাদাসিধে কিন্তু আগুন ধরানোটা বীরের মতো। আলো জ্বালানো বারণ কিন্তু আগুন ধরানো বোমার পূজা চলছে। আপনি হয়তো সার্কাসে দেখে থাকবেন যে কৃষিকাজের উপযোগী একটা বলদকে মেরে ফেলা হচ্ছে বাঘের খাদ্য জোগাতে গিয়ে। এই হচ্ছে 'যুগধর্মের' উদাহরণ।

দারিদ্র্যের মধ্যে আনন্দ পেতে হলে

একজন শিক্ষকও নিজের ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবেন বলে অন্য লোকের সাহায্য নেন, একজন ডাক্তারও নিজের অসুখ হলে অন্যলোককে ডাকেন রোগ সারাতে। কিন্তু কিভাবে জীবন যাপন করা উচিত এই প্রশ্নের উত্তর আমার মনে হয় প্রত্যেককে নিজে থেকেই স্থির করতে হবে। কারণ অন্য লোকে যেসব প্রেসক্রিপশান্ দেয়, হামেশাই দেখা গেছে যে সেগুলো শুধু কাগজের অপব্যবহার।

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষকে দারিদ্র্যের মধ্যে আনন্দ খুঁজে নেবার জন্যে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে এটি এক বিশাল ভূমিকা পালন করেছে। বহু ধরনের প্রেসক্রিপশান চালু থাকা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত কিন্তু একটিও পুরোপুরি কার্যকরী হয়নি। তাই নিত্য নতুন প্রেসক্রিপশানের আবির্ভাব ঘটছে তো ঘটছেই। সম্প্রতি এ রকম দুটি প্রেসক্রিপশান্ আমার চোখে পড়েছে কিন্তু তার একটাও আমার খুব একটা যুতসই বলে মনে হয়নি।

প্রথম প্রেসক্রিপশান্‌টি মানুষকে তার নিজের কাজের প্রতি আগ্রহী করে তোলার কথা পেড়েছে। একবার যদি কাজে আগ্রহ পাও তো ব্যস্—তোমার কাজটা যাই হোক্ না কেন এরপর থেকে তুমি নাকি মনের আনন্দে কাজ করতে পারবে, কখনোই ক্লান্তি বোধ করবে না। কথাটার মধ্যে নিশ্চয় কিছু সত্য আছে, কিন্তু হ্যাঁ—কাজটাকে সে ক্ষেত্রে অতি অবশ্য হাব্বা গোছের একটা কিছু হতে হবে। খনন কার্যে নিযুক্ত শ্রমিক আর যারা গোবর ইত্যাদি কুড়িয়ে

বেড়ায় তাদের কথা না হয় নাই তুললাম।. সাংহাইয়ের কারখানাগুলোয় শ্রমিকদের কথাই ধরা যাক। এদের প্রতিদিন কমপক্ষে দশ ঘণ্টা করে খাটতে হয়। সন্ধ্যে নাগাদ এরা নিশ্চয় মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে, তা না হলে বেশীর ভাগ দুর্ঘটনা এই সময়টাতেই বা ঘটে কেন! আমাদের 'সুস্থ শরীরে সুস্থ চিন্তা'র বিকাশ ঘটাতে বলা হয়। কিন্তু শরীরের দিকে নজর দেবার যদি সময়ই না না থাকে তা হলে আগ্রহটা আসবে কোত্থেকে? অবশ্য কেউ যদি নিজের প্রাণের চেয়ে এই আগ্রহটাকেই বেশী ভালবাসে তাহলে আলাদা কথা! শ্রমিকদের জিজ্ঞাসা করলে আমার ধারণা তারা নিশ্চয় কাজের সময়টা কমাতে বলবে। আগ্রহ সঞ্চার করার এই পদ্ধতির কথা তারা সবচেয়ে আজগুবী স্বপ্ন দেখার সময়েও চিন্তা করবে না।

এছাড়াও আরো একটি আছে, সবচেয়ে বিচক্ষণ একটি প্রেসক্রিপশান্। ওরা বলে খর গ্রীষ্মের সময় ধনীরা তাদের সামাজিক দেখা-সাক্ষাতের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে তাদের পিঠ বয়ে তখন ঘাম গড়ায়। গরিবরা কিন্তু রাস্তার ওপরে একটা ছেঁড়াখোঁড়া মাদুর পেতে জামা খুলে মৃদু বাতাসে শরীর জুড়োয়—কী দারুণ মজা বলুন তো! একেই তো বলে "মাদুর গুটোবার মতো বিশ্ব জয় করে ফেলা"। এটা একটা বিরল ও অত্যন্ত কাব্যিক প্রেস্‌ক্রিপশান্। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর পরেই আবার একটা বিষাদময় দৃশ্য স্থানলাভ করে। শরৎকাল আসার পর রাস্তা দিয়ে হাটবার সময় দেখতে পাবেন অনেকে পেট চেপে ধরে তামাটে রঙা একটা তরল বমি করছে। এরাই মর্তে স্বর্গসুখ উপভোগ করেছিল এবং "মাদুর গোটাবার মতো বিশ্বজয় করেছিল"। আমার ধারণা এমন বোকা লোক খুব কমই আছে যে সুখী হবার সুযোগ আছে দেখেও তা গ্রহণ করে না। দারিদ্র্য যদি সত্যিই এত আনন্দের ব্যাপার হত, আমাদের ধনী সম্প্রদায় সর্বপ্রথম রাস্তায় গিয়ে ঘুমোত, গরিবদের মাদুর বিছোবার জন্য আর জায়গা রাখতো না।

সাংহাইয়ে সম্প্রতি যে পরীক্ষা হল তাতে উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের লেখা শ্রেষ্ঠ উত্তরপত্র গুলো মুদ্রিত করা হয়েছে। "ঠাণ্ডা রোখার মতো কাপড়-চোপড় আর পেট ভরাবার মতো খাবার" নামে একটি রচনা থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি:

"কোন ব্যক্তি যদি পুণ্য সঞ্চয়ে ব্রতী হয় তা হলে সে যত দরিদ্রই

হক্ এবং দিনে তিনবার পেট ভরে নাও খেতে পাক্, বংশ পরম্পরায় লোকে তার নাম করবে। আধ্যাত্মিক জীবনে সে যদি ধনবান হয় তাহলে দৈনন্দিন জীবনের দারিদ্র্য নিয়ে সে কেন চিন্তা করবে? মানব জীবনের সত্যকার পরীক্ষা হচ্ছে প্রথমটি, শেষোক্তটি নয়…"

(নিউ অ্যান্সিভোট্স' নামক পাক্ষিকের তৃতীয় সংখ্যা থেকে)

দেখা যাচ্ছে যে এই রচনার বক্তব্য রচনার নামটিকে অবধি টেক্কা দিয়েছে। পেট ভরাবার প্রয়োজনটা অবধি স্বীকার করা হচ্ছে না। উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রের লেখা এই চমৎকার প্রেস্‌ক্রিপশান্‌টি কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকেরা গ্রহণ করেনি। তাদের অনেকেই এখন চাকরি দিতে হবে বলে সোরগোল তুলেছে।

বাস্তব ঘটনা মাত্রেই একেবারে করুণাহীন এবং সব ফাঁকা বুলিকেই তা একেবারে ছিন্নভিন্ন করে ছেড়ে দেয়। তাই এইসব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও আমার বিনীত অভিমত কিন্তু এই যে অনেক তো হয়েছে, এবার এসব পাণ্ডিত্যাভিমানী কচ্‌কচানি থামানো দরকার। না থামালেও অবশ্য এতে করে কোন কাজ হবে না।

ব্যঙ্গ রচনা বলতে কী বোঝায়

—সাহিত্য সংঘের প্রশ্নের উত্তর—

এক একদল লোকের কোন কোন বিশেষ কীর্তিকলাপের অন্তর্নিহিত সত্যটি উদ্‌ঘাটন করবার জন্য লেখকেরা অনেক সময় কাটাকাটা ভাষার আর নয়তো অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেন। বলাইবাহুল্য যে শিল্পসঙ্গত ভাবেই তা করতে হয়। আমার বিশ্বাস এই ধরনের লেখা যাদের লক্ষ্য করে লেখা হয় তারাই রচনাগুলিকে 'ব্যঙ্গ রচনা' বলে।

ব্যঙ্গ রচনার প্রাণ জোগায় সত্য ঘটনা। সত্য ঘটনা বলতে কিন্তু শুধু সেই সব ঘটনাই বোঝায় না যা ইতিপূর্বে ঘটে গেছে। ভবিষ্যতে ঘটতে পারে বলে মনে হচ্ছে এমন ঘটনাকেও ব্যঙ্গ রচনার বিষয় করা সম্ভব। তাই ব্যঙ্গ-রচনা যেমন "অলীক কল্পনা" নয় তেমনি "কুৎসা"-ও নয়। ব্যঙ্গ রচনা মানে "গোপন তথ্য প্রকাশ করা"-ও নয় আবার সোজাসুজি

"চাঞ্চল্যকর সংবাদ" বা "বিচিত্র ঘটনা" লিপিবদ্ধ করাও নয়। বর্নিত ঘটনাগুলো সর্বজনসমক্ষে হামেশাই ঘটে, কিন্তু সাধারণত এগুলোকে নেহাতই মামুলি মনে হয় বলে এদিকে আর স্বাভাবিক ভাবেই কোন দৃষ্টি পড়ে না। অথচ এইসব ঘটনা অযৌক্তিক, উদ্ভট, ঘৃণ্য আর রুচিহীন। তা সত্ত্বেও দৃষ্টি না পড়ার একমাত্র কারণ ক্রমান্বয়ে ঘটতে থাকার ফলে ঘটনাগুলো মানুষের চোখ-সওয়া হয়ে গেছে। সর্বজনসমক্ষে, জনসাধারণের মধ্যেও এ-ধরনের কিছু যখন ঘটে তা আর বিস্ময় জাগায় না। কিন্তু যে-মুহূর্তে এদিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় অমনি একটা সাড়া পড়ে যায়। যেমন ধরুন, পশ্চিমী বেশধারী একজন তরুণের পক্ষে বুদ্ধদেবের পূজা করাটা খুবই সাধারণ ব্যাপার এবং আরো সাধারণ একজন নীতি-বাগিশের পক্ষে মেজাজ গরম করা। এসব ঘটতে মাত্র দু'এক মিনিট লাগে, তারপর আর তার রেশ-লেশ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু "ব্যঙ্গ" যদি ঠিক এই তক্কে তরুণটির হাঁটু গেড়ে পশ্চাদ্দেশ শূন্যে তুলে প্রণামকরার আর নীতিবাগিশের গজরানির ফটো তুলে নেয়, সেগুলো যে শুধু দর্শকের চক্ষুপীড়ার কারণ হবে তাই নয়, তাদের নিজেদেরও তাই হবে। এইসব চিত্র বিলি করা মানেই এনাদের বিজ্ঞান বা কনফুসীয় রীতিনীতি প্রচারের উচ্চাশা মণ্ডিত কার্যসূচীর বিঘ্ন ঘটানো। ছবিগুলি সাচ্চা নয় বলে কোন লাভ নেই কারণ প্রত্যেকেই এদের চেনে এবং এরকম কিছু সত্যিই যে ঘটে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কিন্তু একথা স্বীকার করে না। স্বীকার করলে যে আর মুখ বাঁচানো যায় না। অতঃপর ধূর্ততার আশ্রয় নিয়ে এরা এগুলোকে "ব্যঙ্গ-রচনা" বলে অভিহিত করে। ভাবটা এই যে পূর্বপ্রকার ঘটনাবলী নিয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে মাথা ঘামাবার অপরাধে তুচ্ছ ও মূল্যহীন রচনাগুলোই ব্যঙ্গ-রচনা।

কিন্তু ব্যঙ্গের কাজই তো এইসব ঘটনা নিয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে মাথা ঘামানো। ঘটনাগুলোর সারমর্ম নিষ্কাশন করা বা প্রয়োজনে অতিরঞ্জিত করা পর্যন্ত ব্যঙ্গের এক্তিয়ার ভুক্ত। সযত্নে ও শিল্পাশ্রয়ী পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ না করতে পারলে অনেক ঘটনা কিন্তু সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ব্যঙ্গ-রচনা হয় না, কারুর মনে দাগ কাটতে পারে না। উদাহরণ দিতে গিয়ে এই বছরের দু'দফা সংবাদের কথা মনে পড়ছে। প্রথমটি এক তরুণকে নিয়ে। লোক ঠকাবার জন্যে সে সেনাবাহিনীর অফিসার সেজে ঘুরে বেড়াত।

ধরা পড়ার পর ছেলেটা তার স্বীকারোক্তিতে লিখেছিল যে স্রেফ জীবিকা অর্জনের তাগিদেই সে এইসব করেছে, অন্য কোন কারণই ছিল না। এবার দ্বিতীয় ঘটনাটার কথা বলি। ব্যাপারটা একটা চোরকে নিয়ে। এই লোকটা ছাত্র যোগাড় করে তাদের চুরি করতে শেখাতো। ছেলেদের বাবা মা-রা ঘটনাটা জানতে পেরে ছেলেদের ঘরের মধ্যে আটকে রাখলে চোরটা নাকি তাঁদের শাসানিও দিয়েছিল। কাগজে প্রায়ই এমন অনেক ঘটনার ওপর বিশেষ মন্তব্য প্রকাশিত হয় যা তুলনামূলক বিচারে নেহাতই তুচ্ছ। তা সত্ত্বেও কিন্তু এই ঘটনা দুটির ওপর এ পর্যন্ত কোন অভিমত প্রকাশ করা হয়নি। অর্থাৎ ঘটনাগুলিকে এমন কিছু অস্বাভাবিক বলে কেউ মনে করেনি যে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই হবে। কিন্তু এই মালমশলাই যদি সুইফ্‌ট্‌ কী গোগোলের হাতে পড়তো, আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে দু'টি চমৎকার ব্যঙ্গ রচনা লেখা হত। বিশেষ বিশেষ সমাজে এক একটা ঘটনা যত মামুলি আর যত সুলভ হয় ব্যঙ্গ রচনার বিষয় হিসেবে ততই তার উপযোগিতা বাড়ে।

ব্যঙ্গকার যাদের ব্যঙ্গ করেন তাদের কাছ থেকে সাধারণত তিনি ঘৃণাটুকুই শুধু লাভ করেন। আসলে কিন্তু ব্যঙ্গকারের উদ্দেশ্য যে খারাপ কিছু তা নয়। তিনি এই আশা করেই লেখেন যে এইসব লোকে ভালোর দিকে ফিরবে। কোন একটি গোষ্ঠিকে জলে ডুবিয়ে মারাটা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। সে যাই হোক, একটি গোষ্ঠির মধ্যে যে সময়টা পার হবার পর একজন ব্যঙ্গকারের আবির্ভাব হয়, তারই মধ্যে গোষ্ঠিটির বিনাশপ্রাপ্তি কিন্তু আসন্ন হয়ে পড়ে। শুধু লেখনীর জোরে সে বিনাশ রোধ করা সম্ভব হয় না। কাজেই ব্যঙ্গকারের উত্তম সাধারণত বৃথাই যায়। কখনো আবার এমনও হয় যে উল্টো ফলটা ফলে। কারণ তিনি যখন কোন বদমাইশির বা ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা সবাইকে জানিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত, তাঁর গোষ্ঠির প্রতি বিরূপ কোন গোষ্ঠি এর সুযোগ নিতে ছাড়ে না। আমার ধারণা যাদের ব্যঙ্গ করা হয় তারা যে চোখে ঘটনাগুলো দেখে এই বিরোধী গোষ্ঠিটি কিন্তু ঠিক সেভাবে তা দেখে না। "ব্যঙ্গ-রচনা"র বদলে এটিকে তারা ফাঁস করে দেওয়া বলেই মনে করে।

কোন রচনা যদি ব্যঙ্গের মত মনে হয় অথচ তার বিশেষ কোন লক্ষ্য না থাকে এবং আন্তরিক অনুভূতি বর্জিত হয় এবং পাঠককে শুধু এই মর্মেই

বিশ্বাস করছে বলে যে এ-পৃথিবীতে ভাল বলে কিছু নেই, করবার মতে কিছু নেই, তবে তা ব্যঙ্গ নয়—সেটা "হতাশা"।

গভীর রাতে লেখা

(অংশ বিশেষ)

৩. একটি লৌক-কাহিনী

১৭ই ফেব্রুয়ারীর 'ডয়েচে ৎসণ্টাল ৎসাইটুঙ'-এ হাইনের অশীতিতম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণার্থে লেখা উইলি ব্রেডেলের 'একটি লোক-কাহিনী' পড়লাম। এই নামটি আমার বেশ পছন্দ হয়েছে তাই নিজেই এবার এমনি একটি লোক-কাহিনী লিখছি।

বহুকাল আগে এমন একটি দেশ ছিল যেখানে ক্ষমতাসীনরা দেশবাসীকে চূড়ান্তভাবে নিষ্পেষিত করার পরেও তাদের চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করত। মনে করত এদের ল্যাটিনীয় ধাঁচের অক্ষরগুলো মেসিনগান, আর কাঠ-খোদাই গুলো ট্যাঙ্ক। বিজয়ী হয়েও তারা যথাযথ স্টেশনে ট্রেন ছেড়ে নামত না। পৃথিবীর ওপর থাকাটা নিরাপদ বলে মনে না হওয়ায় তারা আকাশে আকাশে বেড়াত। আর তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা এতই কমে গেছল যে আপতকালীন সময়ে তারা ফ্লু আক্রান্ত হল। মন্ত্রীদেরও তারা ছোঁয়াচ লাগল। অতঃপর সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ল।

এরা হোঁৎকা হোঁৎকা অভিধান ছাপিয়েছিল বেশ কয়েকটা। কিন্তু তার কোনটাই কাজ লাগেনি। আসল অবস্থাটা বুঝতে হলে এমন একটা অভিধানের কথা পাড়তে হয় যা এখনো ছাপা হয়নি। এর মধ্যে একেবারে মৌলিক নানা সংজ্ঞার সাক্ষাৎ মেলে। 'মুক্তি'র অর্থ 'প্রাণদণ্ড'। 'টলস্টয়ের দর্শন' মানে 'পৃষ্ঠ প্রদর্শন'। 'চাকুরে'র সংজ্ঞা 'আত্মীয় বন্ধু এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তির ক্রীতদাস'। 'শহর'-এর বর্ণনা—'ইষ্টক নির্মিত উচ্চ ও মজবুত দুর্গপ্রাচীর যা ছাত্রদের আনাগোনা বন্ধ করে'। 'নৈতিকতা'-হল 'মহিলাদের নগ্ন বাহু প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা'। আর 'বিপ্লব' মানে 'জমিজমায় প্লাবন বওয়ানো, 'ডাকাত'দের ওপর বোমা ফেলা'।

এরা বহু খণ্ডে বিভক্ত আইন সংক্রান্ত বৃহদাকার গ্রন্থ প্রকাশ করেছিল। বিদ্বান ব্যক্তিদের তো এই জন্তেই এরা বিদেশে পাঠায়। বিভিন্ন দেশের আইন-কানুন দেখে-শুনে তার মধ্যে থেকে সেরা অংশটুকু বেছে বেছে বিদ্বানরা এমন একটা সর্বদিক পরিব্যাপী সঙ্কলন তৈরী করে দেবে যেমনটি আর কোন দেশেই নেই। কিন্তু একেবারে গোড়ার দিকে একটা খালি সাদা পাতা ছিল। অপ্রকাশিত ঐ অভিধানটা যারা পড়েছে তাদের পক্ষেই কেবল এই সাদা পাতাটির মর্মোদ্ধার করা সম্ভব। এখানে তিনটি শর্তের উল্লেখ আছে। এক, কোন কোন ঘটনা সহিষ্ণু ভাবে বিচার করতে হবে। দুই, কোন কোন ঘটনা নির্দয় ভাবে বিচার করতে হবে। তিন, সর্বক্ষেত্রেই যে এই শর্তদ্বয়ের যে কোন একটি কার্যকর হবে তা নয়।

এই দেশটিতে আদালতও ছিল বইকি! তবে কিনা যেসব বন্দী ঐ সাদা পাতাটা পড়বার সুযোগ পেয়েছে তারা কখনো আদালতে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেনি। কারণ একমাত্র দুষ্কৃতকারীরাই প্রতিবাদ করে এবং যারাই প্রতিবাদ করে নির্দয়ভাবে তাদের শায়েস্তা করা হয়। সে দেশে একটা বিচারালয়ও ছিল বইকি! কিন্তু যারা ঐ সাদা পাতাটা পড়তে পেয়েছে তারা কখনও আবেদন জানায়নি। কারণ দুষ্কৃতকারীরাই কেবল আবেদন জানায় এবং যারাই আবেদন জানায় নির্দয়ভাবে তাদের শায়েস্তা করা হয়।

একদিন সকালে একদল সশস্ত্র পুলিস একটা শিল্প শিক্ষায়তন ঘিরে ফেলল। চীনা আলখাল্লা পরা কয়েকজন লোক আর কয়েকজন পশ্চিমী বেশধারী স্কুলের মধ্যে ছোটাছুটি লাগিয়ে দিল। তন্ন তন্ন করে সব খুঁজে দেখছে। পুলিসরা তাদের পেছনে পেছনে এল, সবার হাতেই পিস্তল। অতঃপর বহুশয্যা বিশিষ্ট শয়নকক্ষে পশ্চিমী বেশধারীদের মধ্যে একজন বছর আঠারোর একটি ছাত্রকে পাকড়াও করল। "সরকারের তরফ থেকে এসেছি খোঁজ করে দেখতে। তুমি কি..."

"বেশ তো দেখুন না।" ছেলেটি অবিলম্বে বিছানার তলা থেকে নিজের সুটকেসটা টেনে বার করল।

বহু বছরের অভিজ্ঞতা এখানকার বুদ্ধিমান তরুণদের এই শিক্ষাই দিয়েছে যে সন্দেহভাজন হবার মতো কোন কিছু কাছে রাখবে না। কিন্তু ছেলেটি যে মাত্র আঠারো বছরের বালক। তাই একটা ড্রয়ারের মধ্যে কয়েকটা চিঠি আবিষ্কৃত হল। ওর মা কি দুরবস্থার মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন এগুলোতে

সেই সব বিবরণই ছিল। আপ্রাণ চেষ্টা করেও পোড়াতে পারেনি। একজন পশ্চিমী বেশধারী ভদ্রলোক সতর্কভাবে প্রতিটি শব্দ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চিঠিগুলো অধ্যয়ন করতে থাকেন। ভুরু তুলে তিনি তাকান, যখন চোখে পড়ে…"পৃথিবী এমন একটা ভোজসভা যেখানে মানুষ মানুষকে খায়। তোমার মায়ের মতোই এই পৃথিবীর অসংখ্য মায়েদের খেয়ে ফেলা হচ্ছে…" একটা পেন্সিল বার করে এই অংশটার তলায় উনি দাগ দিয়ে নেন। প্রশ্ন করেন, "এর মানে কি?"

ছেলেটি নীরব।

"কে তোমার মাকে খেয়েছে? এই জগতে কি মানুষ মানুষকে খায়? আমরা তোমার মাকে খেয়ে ফেলেছি নাকি?" লোকটার দু'চোখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

"না, নিশ্চয় …ঠিক তা নয়…।" ছেলেটি বিচলিত বোধ করে। চোখ দিয়ে ওকে গুলি না করে ভদ্রলোক তার বদলে চিঠিটা পাট করে একটা পকেটের মধ্যে গুঁজে রাখলেন। তারপর ছাত্রটির কাঠ খোদাই, ছুরি, ছাপা ছবি, লৌহ নদী, ধীর প্রবাহিনী ডন এবং সেই সঙ্গে কিছু খবরের কাগজের ছাঁটাই একত্রিত করে একজন পুলিশকে বললেন, "এগুলো নিয়ে নাও।"

"ব্যাপার কি!" ছেলেটা জানত ব্যাপারটা খারাপ দাঁড়াচ্ছে। তবু না জিজ্ঞেস করে পারল না। "এগুলো নিয়ে যাচ্ছেন কেন?"

পশ্চিমী বেশধারী ভদ্রলোক ওর দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, তারপর ছেলেটাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আরেকজন পুলিশকে বললেন, "নিয়ে যাও একে।"

পুলিশটা বাঘের মতো ছেলেটার সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে এল। দরজার বাইরে আরো দুজন একই বয়সী ছাত্র দাঁড়িয়েছিল। শক্ত হাতে পুলিশগুলো তাদেরও ঘাড় চেপে ধরল। চারপাশে তখন শিক্ষক আর ছাত্ররা ভিড় করে দাঁড়িয়ে।

৪. আরেকটি লোক-কাহিনী

এর একুশ দিন বাদের কথা। একটি পুলিশ থানায় সকাল বেলায় জেরার কাজ চলছিল। একটা ছোট অন্ধকার ঘরে দু-জন সরকারী কর্মচারী বসেছিল।

একজন ডানদিকে, অন্যজন বাঁয়ে। ডানদিকে যে তার গায়ে চীনা কুর্তা, বাঁদিকের লোকটির পশ্চিমী পোশাক। শেষোক্ত জন আশাবাদী। এই পৃথিবীতে মানুষে মানুষ খায় একথা অস্বীকার করেন। জবানবন্দী লিখে নিয়ে যেতে এসেছেন। চেঁচাতে চেঁচাতে, গালিগালাজ করতে করতে পুলিশেরা একটি আঠার বছরের ছাত্রকে ভেতরে টেনে নিয়ে আসে। তার বিবর্ণ মুখ জামা কাপড় নোংরা। ছেলেটি ওদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। চীনা সরকারী কর্মচারী, ওর নাম, বয়স আর জন্মস্থান জেনে নিয়ে তারপর জেরা শুরু করে।

"তুমি কি "কাঠ-খোদাই" সংঘের সদস্য ?"

"হ্যাঁ।"

"এটা কে চালায় ?"

"চেয়ারম্যান চো আর ভাইস চেয়ারম্যান ও…"

"এরা এখন কোথায় ?"

"জানিনা—এদের দু'জনকে আগেই স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।"

"নিজের স্কুলে গণ্ডগোল বাধাবার চেষ্টা করেছিলে কেন ?"

"মানে ?" ছেলেটা অবাক হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।

'হুঁ!' চীনা কুর্তা ওকে একটা কাঠ-খোদাই দেখায়, "এটা তুমি করেছো ?"

"হ্যাঁ।"

"ইনি কে ?"

"একজন লেখক।"

"নাম কি ?"

"লুনাচার্স্কী।"

"ইনি লেখক ? কোন দেশের ?"

"জানি না।" নিজেকে বাঁচাতে ছেলেটা মিথ্যে কথা বলল।

"জান না ? আমাকে ঠকাতে চেষ্টা করো না। রাশিয়ান না ? লাল ফৌজের একজন অফিসার নিশ্চয় ? রুশ বিপ্লবের ইতিহাসের একটা বইয়ে আমি এঁর ছবি দেখেছি। কথাটা তুমি অস্বীকার করতে পারো ?"

"মিথ্যে কথা!" ছেলেটা এতটা আশা করেনি। হতাশায় চেঁচিয়ে ওঠে।

"না, না এই রকম হওয়াটাই তো উচিত। একজন প্রলেতারীয় শিল্পী হিসেবে লাল ফৌজের একজন অফিসারের ছবি আঁকাটাই তো স্বাভাবিক।"

"না, আমি বলছি তো যে আমি কখনও…"

"তর্ক কোরো না। এত একগুঁয়েমী ভালো নয়। আমরা জানি যে পুলিশ থানায় তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। এখন যা জান তাই তোমার খুলে বলা উচিত। আমরা তাহলে তোমাকে শাস্তি দেবার জন্যে আদালতে পাঠাবো, জেলে অনেক আরামে থাকবে।"

ছেলেটা কিছুই বলল না। জানে কথা বলা বা চুপ করে থাকা দুই-ই সমান অর্থহীন।

'কথা বল্।' চীনা কুর্তা খেঁকিয়ে ওঠে, 'তুই 'সি, পি' না 'সি, ইউ' ?*

'কোনটা তুই ?'

"কোনটাই নয় ! আপনি কি বলতে চাইছেন কিছুই বুঝতে পারছি না !"

"আ-চ্ছা ! লালফৌজের অফিসারের ছবি আঁকতে পারিস অথচ 'সি.পি,' ও 'সি.ইউ' কি জানিস না ? এই বয়সেই এত ধূর্ত ! গেট আউট !" ইঙ্গিতে বহিষ্কারের নির্দেশ পেয়ে বহুদিনের অভ্যাসলব্ধ নিপুণতায় একজন পুলিশ ওকে টেনে বার করে নিয়ে গেল।

এগুলি যদি আর লোক-কাহিনীর মতো না শোনায় তাহলে আমার মাপ চাওয়াই উচিত। কিন্তু এগুলিকে যদি লোক-কাহিনী না বলি তো কি বলব ? সব চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, ঘটনাটা কখন ঘটেছিল তা আমি বলতে পারি। ১৯৩২ সালে।

৫. এবার একটি সত্যিকার চিঠি

৪ঠা এপ্রিল, মধ্যরাত্রির পর

মিঃ চৌ মাননীয়েষু,

আপনি আমায় জিজ্ঞেস করেছেন পুলিস থানা থেকে বেরোবার পর কি ঘটেছিল। অল্প কথায় সেই কাহিনীই বলছি।

ওই বছরেরই শেষ মাসের শেষ দিনটিতে প্রাদেশিক সরকার আমাদের প্রধান বিচারালয়ে পাঠিয়ে দিল। বিচারও হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সরকারী পক্ষের উকিল অদ্ভুত ধরনের জেরা করলেন, তিনটি মাত্র প্রশ্ন। এক : "তোমার নাম কি ?" দুই : "কত বয়স তোমার ?" তিন : "তোমার বাড়ি কোথায় ?"

---

* কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বা কমিউনিস্ট ইউথ লীগের সদস্য।

এই অদ্ভুত বিচার শেষ হ'লে আদালত আমাদের সামরিক কারাগারে প্রেরণ করল। কেউ যদি আমাদের শাসকদের শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করতে চায় তাকে একবার শুধু সামরিক কারাগারে গেলেই হবে। প্রাণনাশের বা অত্যাচারের কোনো উপায়ই এরা খুব একটা নিষ্ঠুর বলে মনে করে না। যখনই অবস্থা ঘোরালো হয়ে ওঠে একদল তথাকথিত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বন্দীকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় গুলি করে মারা হবে বলে। তাদের বন্দীত্বের কাল যাই নিরূপিত হয়ে থাক্ না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। যেমন নানচাঙ্ যখন বিপদের মুখে,* পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে বাইশজনকে হত্যা করা হয়। ফুকিয়েনে গণ-সরকার** প্রতিষ্ঠিত হ'লে এর চেয়ে আরো অনেক বেশী লোককে গুলি করে মারা হয়। এই বধ্যভূমিটা ছিল জেলখানার শাক-সব্জী ফলাবার বাগান। আয়তনে পাঁচ 'মোউ'। মৃতদেহগুলো সার হিসাবে বাগানে পুঁতে ফেলা হ'ত, আর জমিতে শাক্-সব্জী ফলতো।

আড়াই মাসটাক পরে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্রটি এসে পৌঁছয়। আপনি নিশ্চয় ভাবতে পারছেন না যে বিচারক মাত্র তিনটি প্রশ্ন করেই কি করে একটা অভিযোগপত্র খাড়া করেন, তাই না? কিন্তু দেখা যাচ্ছে তিনি তা করেছিলেন। এখন আর আমার কাছে সেই কাগজখানা নেই তবু আইনী শর্তগুলো বাদে—দুর্ভাগ্যবশতঃ যা আমি ভুলে গেছি—বাকী সবটা মুখস্ত বলে যেতে পারি।

"'চো—' ও 'শু—' কর্তৃক সংগঠিত এই উড্-কাট্ ক্লাবটি কমিউনিস্টরা পরিচালিত করতো প্রলেতারীয় শিল্প নিয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে। অভিযুক্তরা সবাই এই ক্লাবের অন্তর্ভুক্ত…এদের তৈরী সব উড্-কাট্ গুলোই লালফৌজের অফিসার, শ্রমিক এবং অনাহারী মানুষকে উপস্থাপিত করেছে। উদ্দেশ্য

* ১৯৩৩-এর এপ্রিলে লাল ফৌজ কুয়োমিণ্টাঙের চতুর্থতম বেষ্টনী অভিযান চূর্ণ করে নানচাঙ দখল করে নেবার শাসানি দিয়েছিল।

** ১৯৩৩-এর নভেম্বরে কয়েকজন স্বদেশ প্রেমিক কুয়োমিণ্টাঙ জেনারেল ফুকিয়েনে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান। চিয়াঙ কাই-শেক সত্বর তাদের দমন করে।

—শ্রেণীসংগ্রামকে খুঁচিয়ে তোলা এবং সর্বহারার একনায়কত্বের অবশ্যম্ভাবিতা দেখানো…”

এর পরে খুব শীঘ্রই আমাদের বিচার হয়। পাঁচজন জব্বর সরকারী কর্মচারী তখন এক সারিতে বসে। আমি যে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পেরেছিলাম তার কারণ ঠিক সেই সময়ে একটি ছবির কথা মনে পড়ে গেছল। হনর ডমিয়েরের আঁকা এই ছবিটির নাম 'বিচারকেরা'। সেই মুহূর্তে উপলব্ধি করেছিলাম যে এ-ছবিটি শিল্পীর কী উজ্জ্বল সৃষ্টি।

বিচারের পর অষ্টম দিবসে শেষ অধিবেশন বসল রায় জারী হবে বলে।

আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্রে যা লেখা ছিল এখনো তাই রইল তবে তার শেষ অংশে আরেকটা অনুচ্ছেদ যুক্ত হ'ল :

“এদের অপরাধ বিচার করে এবং ফৌজদারী আইনের ধারার শর্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রকে বিপন্ন করেছে বলে প্রত্যেকের পাঁচ বছর করে কারাবাস হওয়া উচিত। কিন্তু এদের কম বয়স আর বোকামির সুযোগ নিয়ে অন্যেরা এদের বিপথগামী করেছে বলে এদের অপরাধ খানিকটা মার্জনা করা যেতে পারে। অতঃপর—আইনের—শর্ত অনুযায়ী এদের দণ্ডাদেশ কমিয়ে আড়াই বছর করা হ'ল। এদের যদি কোন আপত্তি থাকে তাহলে দশ দিনের মধ্যে সেই মর্মে আবেদন করতে পারে…”

আবেদন করে লাভটা কি হবে? স্বাভাবিক ভাবেই তাই আমি কোনো 'আপত্তি' জানাইনি। যতই যাই হোক্ না কেন এসব আইনকানুন তো আসলে ওদেরই জন্যে।

সংক্ষেপে বাকীটা বলি: গ্রেপ্তারের দিন থেকে শুরু করে যেদিন মুক্তি পেলাম তার মধ্যে আমি তিনটে জবাই-ঘর দেখেছি যেখানে ওরা মানুষ মারতো। শুধু আমার মাথাটাকে কেটে নেয়নি বলেই নয়, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করেছে বলেও ওদের ধন্যবাদ জানানো উচিত। এখানেই আমি প্রথম জানতে পারলাম বর্তমানে চীনে অত্যাচারের নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো চালু। এক নম্বর—'র‍্যাটান' বেতের সাহায্যে চাবকানো। দু'নম্বর—'লেগ-প্রেস্'। কিন্তু এ দু'টোই বেশ হাল্কা গোছের। তিন নম্বর—লোহার রড দিয়ে অত্যাচার। অপরাধীকে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দেওয়া হয় তারপর হাঁটুর কাছে পাটা যেখানে ভাঁজ হয়ে থাকে তার উপর একটা লোহার রড রেখে রডের দুই প্রান্তে দু'জন হোঁৎকা লোক চড়ে দাঁড়ায়, আর

লোকের সংখ্যাটা ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে আটজনে গিয়ে পৌঁছয়। চার নম্বর—উত্তপ্ত রক্তবর্ণ শেকল। শেকলটা মাটির ওপর বিছিয়ে দিয়ে অপরাধীকে আদেশ দেওয়া হয় তার ওপর হাঁটু গেড়ে বসতে। পাঁচ নম্বর—পানীয় দ্রব্যের সাহায্যে অত্যাচার। নাকের মধ্যে গরম লঙ্কার ঝোল, প্যারাফিন্, ভিনিগার ও মদ ঢেলে দেওয়া। ষষ্ঠ অত্যাচার—অভিযুক্তকে তার বুড়ো আঙুলে পাটের দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা এবং শূন্যে দোদুল্যমান অবস্থাতেই তাকে প্রহার করা। এই অত্যাচারের নামটা আমি জানিনা।

কিন্তু পুলিশ থানায় আমার সঙ্গে একই হাজতঘরে বাস করতো এমনি একজন তরুণ কৃষককে ওরা যা করেছিল সেটা নিষ্ঠুরতম। থানার বড়বাবু তখন বার বার তরুণটিকে লালফৌজের অফিসার বলে অভিহিত করছিল। ও কিন্তু জোর গলায় সে কথা অস্বীকার করে। তখন ওর নোখের তলায় ছুঁচ রেখে জোর করে সেগুলোকে ভিতরে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। একটা ছুঁচ ফোটালো, কিন্তু স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারলো না। আরেকটাকে ফোটালো, তবু স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারলো না। তারপর তৃতীয়…চতুর্থ…এক এক করে ওর দশটা আঙুলই ছুঁচে ছুঁচে ভর্তি হয়ে গেল। এখনো সেই তরুণটির মৃতবৎ রক্তশূন্য মুখ, কোটরে বসা চোখ আর রক্তঝরা হাত দু'টো আমার চোখের সামনে ভাসছে, আমায় কোন কথা ভুলতে দিচ্ছে না, আমার হৃদয় বিদীর্ণ করছে…

আমি মুক্তি পাবার পর প্রথম জানতে পারলাম আমার গ্রেপ্তার হবার কারণ কি। গণ্ডগোলের মূল কারণ, আমাদের এখানকার সব ছাত্রই স্কুলের ওপর এবং বিশেষ ক'রে প্রাদেশিক কুয়োমিণ্টাঙ কমিটির যিনি প্রতিনিধি আমাদের সেই প্রক্টরের ওপর অসন্তুষ্ট ছিল। তাবৎ ছাত্রের অসন্তোষ দমন করার উদ্দেশ্যে নিজের ক্ষমতা জাহির করে তিনি 'উড্-কাট্' ক্লাবের বাকী তিনজন সদস্যকেও গ্রেপ্তার করান। লুনাচার্স্কীকে লালফৌজের অফিসার বলে চীনা কুর্তা পরা যে ভদ্রলোক জোর দিচ্ছিল সে আবার প্রক্টরের শালা। কারবার মন্দ নয়!

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা শেষ করে আমি এখন জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছি। মাটির ওপর চাঁদের পাণ্ডুর আলো এসে পড়েছে। একটা হীম শীতল হাত যেন আমার হৃদয়টাকে চেপে ধরেছে বলে মনে

হচ্ছে। আমি নিজেকে কাপুরুষ বলে বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমার হৃদয় শীতল হয়ে গেছে…

আশা করি ভালো আছেন।

জেন্ ফ্যান্

মন্তব্য : 'একটি লোক-কাহিনী'র দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু করে বাকী সবই জেন্ ফ্যানের চিঠি ও তার লেখা 'আমার কারাগার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নির্ভর করে লেখা।

একজন ট্রটস্কিপন্থীর চিঠির জবাব

৯ই জুন (১৯৩৬)

প্রিয় শ্রী চেন,

আমি আপনার চিঠি এবং সেই সঙ্গে 'সংগ্রাম' ও 'স্ফুলিঙ্গ'-র যে সংখ্যা ক'টা পাঠিয়েছেন তাও পেয়েছি।

আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনার চিঠির মোদ্দা বক্তব্য হচ্ছে এই দু'টি : আপনার ধারণা স্তালিন ও তাঁর সহকর্মীরা সবাই আমলা (বুরোক্র্যাট) আর "সব পার্টি মিলে জাপানকে প্রতিহত করুক" ব'লে মাও সে-তুঙ ও আরো অনেকে যে প্রস্তাব করেছেন সেটি বিপ্লবী উদ্দেশ্যর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। সত্যিই এটা আমার কাছে "গোলমেলে" ঠেকছে। স্তালিনের ইউনিয়ন অফ সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক সাফল্য অর্জন করেছে বলেই না ট্রটস্কির নির্বাসন, ভ্রমণ এবং অসাফল্যের করুণ ব্যাপারটা চোখে পড়ছে এবং এর জন্যেই না তাঁকে বৃদ্ধ বয়সে "বাধ্য হয়ে" শত্রুর কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করতে হয়েছে? নির্বাসিত হিসেবে তাঁর এখনকার অবস্থা নিশ্চয় প্রাক্ বিপ্লব পর্বের সাইবেরিয়ায় অবস্থায় থেকে খানিকটা ভিন্ন। কারণ সে সময় কেউ বন্দীদের এক টুকরো রুটি অবধি দিত কিনা আমার সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ট্রটস্কি অবশ্য খুব একটা খুশ-মেজাজে নাও থাকতে পারেন কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন বিজয় লাভ করেছে। সত্য ঘটনা বাকপটুত্বের চেয়ে জোরালো হয়। কেউই এরকম একটা নিষ্করুণ কাজ

আশা করেনি। আপনাদের "তত্ত্ব" নিশ্চয় মাও সে-তুঙের তত্ত্বের চাইতে অনেক উচ্চ মার্গের—আপনাদেরটি আকাশচারী আর মাও সে-তুঙের চিন্তাধারা মৃত্তিকাস্পর্শী। এ ধরনের আকাশে বিচরণের ব্যাপার নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঠিক এই জিনিষটিকেই জাপানী আক্রমণকারীরা সবচেয়ে স্বাগত জানাবে। কাজেই আমার ভয় হয় যে আকাশ থেকে খসে পড়ার সময় এটি বোধহয় পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নোংরা জায়গাটিতেই অবতরণ করবে। জাপানীরা আপনাদের উচ্চমার্গের তত্ত্বকে স্বাগত জানাচ্ছে বলে যেই আপনাদের প্রকাশিত কোনো সুমুদ্রিত বই দেখি আপনাদের জন্যে বিচলিত বোধ না করে পারি না। কেউ যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে আপনাদের হেয় করবার জন্যে এই বলে গুজব রটায় যে আপনারা এইসব প্রকাশ করার জন্য জাপানীদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করছেন তখন কিভাবে নিজেদের খালাস করবেন? আপনাদের কেউ কেউ আরো কয়েকজনের সঙ্গে মিলে আমার বিরুদ্ধে আগে একবার রুশ রুবল গ্রহণ করবার অভিযোগ এনেছিলেন বলেই যে এখন আমি তার শোধ তোলবার জন্যে একথা বলছি তা নয়। না, আমি অত নীচে নামব না এবং আমি এও বিশ্বাস করি না যে জাপানের বিরুদ্ধে একত্রিত হবার জন্য মাও সে-তুঙ ও আরো অনেকের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে গিয়ে আপনারা জাপানীদের হাত থেকে অর্থগ্রহণ করার মতো অত নীচে নামতে পারেন। না, এটা আপনারা করতে পারেন না। আমি কিন্তু আপনাদের সতর্ক হতে বলি কারণ আপনাদের উচ্চমার্গের তত্ত্বকে চীনা জনগণ স্বাগত জানাবে না এবং আপনাদের আচরণ এ কালের নীতিবোধের বিরোধিতা করছে। আপনাদের মতামত সম্বন্ধে এর বেশী আমার কিছু বলার নেই।

পরিশেষে বলি, আপনার কাছ থেকে অকস্মাৎ এই চিঠি আর পত্রিকাগুলো পাবার ফলে আমি খানিকটা অস্বস্তিতে পড়েছি। এগুলো পাঠাবার নিশ্চয় কোন কারণ আছে। আমার ঘনিষ্ঠ কমরেডদের কেউ কেউ আমাকে আমার কয়েকটি ত্রুটির জন্যে অভিযুক্ত করছেন, এইটাই নিশ্চয় সেই কারণ। কিন্তু আমার যে ত্রুটিই থাক্ না কেন আমি নিশ্চিত জানি যে আমার স্বভাবও আপনাদের থেকে একেবারে ভিন্ন। আমি এমন সব মানুষকে কমরেড হিসেবে পাওয়া গর্বের কথা বলেই ধরি যারা এখন বাস্তব কাজ করছেন, দৃঢ় পদক্ষেপে মাটির ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছেন, লড়াই করছেন

এবং চীনা জনসাধারণকে রক্ষা করবার জন্যে নিজেদের রক্ত ঢেলে দিচ্ছেন। এই চিঠিটিকে সর্বজনসমক্ষে পেশ করছি বলে মাপ করবেন, তবে তিন দিনের বেশী যখন পার হয়ে গেছে আপনি বোধহয় আর আমার উত্তর জানবার জন্যে ওই ঠিকানায় যাবেন না।

ইতি—

লু শুন

"তৃতীয় পক্ষ" সম্বন্ধে

গত তিন বছরে শিল্প ও সাহিত্য নিয়ে খুবই কম বিতর্ক হয়েছে। যারা খড়্গের বরাভয় লাভ করে,* যারা নিজেদের "বামপন্থী" ব'লে ঘোষণা করে, যারা মার্ক্সবাদের মধ্যে শিল্পের স্বাধীনতা আছে বলে যুক্তি খুঁজে পায় আর লেনিনবাদের মধ্যে খুঁজে পায় ডাকাত মারার যুক্তি—একমাত্র এরা ছাড়া কারুরই আর মুখ খোলার জো নেই। অবশ্যই "শিল্পের জন্যেই শিল্প"—গোত্রের লেখকরা এখনো "মুক্ত", কারণ এরা কবল গ্রহণ করতে পারে বলে কেউই সন্দেহ করে না। শোনা যায় "তৃতীয় পক্ষ"-র লোকেরা "জীবন দিয়ে সাহিত্যকে আঁকড়ে ধরেছে"। কিন্তু এরাও এখন এই মর্মে একটা তিক্ত পূর্বাভাস পেয়েছে যে বামপন্থীরা ওদের "বুর্জোয়াদের দালাল" বলে ডাকবে।

'আধুনিক জগত' নামে পত্রিকাটির তৃতীয় ও ষষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীমান সু ওয়েন এই "তৃতীয় পক্ষ"-র সমর্থনে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন। (এখানেই বলে রাখা ভাল যে আমি শুধু সুবিধের জন্যে "তৃতীয় পক্ষ"-র "সমর্থনে" ব'লে লিখেছি। আমি অবশ্য জানি যে "হয়তো", "মোটামুটি", "প্রভাবিত" বা এই ধরনের ভাসাভাসা কথার ব্যবহার শ্রীমান সু'র "একদল লেখক" যেমন

---

* হু চি-উয়ান ও অন্যান্য ট্রটস্কীপন্থী। এরা বহু বিষয়ে কুয়োমিণ্টাঙের সাথে একমত পোষণ করতো আর লাল ফৌজকে 'ডাকাত' বলে অভিহিত করতো।

মোটেই পছন্দ করবেন না তেমনি তারা সুনির্দিষ্ট কথার ব্যবহারও মোটেই পছন্দ করবেন না, কারণ যে-মুহূর্তে কেউ একটা সুনির্দিষ্ট লেবেল লাভ করে সে আর "মুক্ত" থাকে না।) সু ওয়েন বিশ্বাস করেন যে বামপন্থী সমালোচকরা সামান্য একটু প্ররোচিত হলেই লেখকদের "বুর্জোয়াদের দালাল" বলে। উনি বিশ্বাস করেন যে বামপন্থীরা নিরপেক্ষদের পর্যন্ত দেশপ্রেমী বলে মনে করে আর যেই কোন লোক নিরপেক্ষতা হারায় অমনি তার "বুর্জোয়াদের দালাল" হয়ে পড়ার ভয় থাকে। উনি বলেছেন যে বামপন্থী লেখকরা কিছুই লেখে না আর তৃতীয় পক্ষের লোকেরা লিখতে চায় কিন্তু ভয়ের চোটে লিখতে পারে না। সেই জন্যেই নাকি সাহিত্য জগতের এই শূন্যাবস্থা। তা সত্বেও কিন্তু, ওনার মতে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্তত একটা অংশ শ্রেণীসংগ্রামকে ডিঙিয়ে যেতে পেরেছে। এইটিই হল ভবিষ্যতের সাহিত্য, খাঁটি অমর সাহিত্য এবং তৃতীয় পক্ষ এই সাহিত্যকেই আঁকড়ে রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বামপন্থী তাত্বিকরা সবাইকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে বলে তারা আর এ-ধরনের লেখা লিখতে পারছে না। কিছু লিখতে শুরু করার আগেই তাদের মনে ভাবী ঝঞ্ঝাটের একটা আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে।

মানুষের এ ধরনের আশঙ্কা থাকা অসম্ভব নয়, বিশেষ করে যারা আবার নিজেদের "তৃতীয় পক্ষ" বলে তাদের তো নয়ই। অবশ্য এমন লেখকও থাকতে পারে যারা শ্রীমান সু'র কথা অনুযায়ী তত্বের ব্যাপার বেশ কিছুটা বোঝে কিন্তু বুঝেও আবেগ-অনুভূতিগুলোকে পাল্টাতে বড় বেগ পায়। আবেগ অনুভূতিগুলোর পরিবর্তিত না হওয়া কিংবা পরিবর্তিত হওয়া বা সামান্য একটু পরিবর্তিত হওয়া—এই সব সম্ভাবনার ওপরেই কিন্তু নির্ভর করছে কে কতখানি তত্ব বুঝতে পেরেছে। দৃষ্টিভঙ্গীর ফারাকটাও হয় এর থেকেই। তবে হ্যাঁ, আমার মতে শ্রীমান সু ওয়েনের দৃষ্টিভঙ্গীটি ভুল।

এটা ঠিক যে বামপন্থী সাহিত্য অস্তিত্ব লাভ করার পর থেকেই তাত্বিকরা কিছু কিছু ভুল করেছেন এবং সু ওয়েনের দাবী অনুযায়ী বামপন্থী লেখকদের মধ্যে সত্যিই অনেকে কিছু লিখছে তো নাই উপরন্তু বাঁ থেকে ডাইনে সরে এসেছে। এদের অনেকে জাতীয় সাহিত্যের আসর পর্যন্ত ভারী করেছে বা বইয়ের দোকানের ম্যানেজার হয়ে বসেছে বা শত্রু দলে গুপ্তচর হিসেবে যোগ দিয়েছে। যেসব সাহিত্যিক বামপন্থী সাহিত্যের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে

পড়েছে তাদেরই হাতে একদা-সৃষ্ট বামপন্থী সাহিত্য কিন্তু এখনো বর্তমান। শুধু তাই নয়, এই বামপন্থী সাহিত্য তার পবিত্র লক্ষ্য অভিমুখে যতই এগিয়ে চলেছে ততই তার উন্নতি ঘটছে, ততই তা নিজের ত্রুটি সংশোধন ক'রে নিচ্ছে।

শ্রীমান স্থ ওয়েন প্রশ্ন করেছেন: "এরা তিন বছরের মধ্যেও নিজেদের ত্রুটিগুলো শুধরে নিতে পারল না কেন?"

এর উত্তর হচ্ছে: শুধরোতে পারেনি বলেই এখনো হয়তো আমাদের আরো তিরিশ বছর লাগবে ত্রুটি শুধরোতে শুধরোতে। এই ত্রুটি সংশোধন কালেই কিন্তু আমরা রাস্তা ক'রে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি। আমরা তেমন বোকা ন'ই যে সব ত্রুটি শুধরে নিয়ে তারপর অগ্রসর হব। স্থ ওয়েন "ঠাট্টা"র ছলে বলেছেন যে বামপন্থী লেখকরা পুঁজিবাদী প্রকাশকদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করছেন। এবার আমি কিন্তু ঠাট্টা না ক'রেই বলছি যে বামপন্থী লেখকরা এখনো নিপীড়িত হচ্ছে, কারারুদ্ধ হচ্ছে এবং এই সামন্ততান্ত্রিক-পুঁজিবাদী সমাজের আইন তাদের হত্যা করছে। এই কারণেই সব বামপন্থী পত্রিকাগুলোই বিনষ্ট হয়েছে বা কোনক্রমে বেঁচে-বর্তে রয়েছে, মাঝ মধ্যে এক আধবার কেবল আত্মপ্রকাশ করছে। তাছাড়া সমালোচনামূলক আলোচনার সংখ্যাও খুবই কম এবং যে কটি আছে সেখানে কখনোই সামান্যতম কারণ ঘটলেই লেখকদের "বুর্জোয়াদের দালাল" বলে চিহ্নিত করা হয় না বা "সহযাত্রীদের" অস্বীকার করা হয় না। যেসব "সহযাত্রী" বামপন্থীদের সঙ্গে কিছুদূর পর্যন্ত এগিয়েছে, বামপন্থীরা যে শুধু তাদেরই সঙ্গে নিতে চায় তাই নয়—বামপন্থীরা চায় পথপার্শ্বে দণ্ডায়মান সকলকেই ডেকে নিয়ে একসঙ্গে মিলে এগোতে।

আরেকটা প্রশ্ন না হয় উত্থাপন করা যাক। বর্তমানে বামপন্থীরা এত নিষ্পেষিত যে তাদের পক্ষে বেশী সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত করা সম্ভব হচ্ছে না, কিন্তু তা প্রকাশিত করার মতো দিন যদি আসে, তাহলে কি তারা সামান্যতম প্ররোচনা মাত্রই "তৃতীয় পক্ষ"কে "বুর্জোয়াদের দালাল" বলে অভিহিত করবে? আমার মনে হয় যে যতক্ষণ না বামপন্থীরা কথা দিচ্ছে যে তারা এমন কাজ করবে না এবং বিষণ্ণ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সব কিছুর বিচার করবে না, ততক্ষণ এর সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু সম্ভাবনা কেন, এর চেয়েও খারাপ কিছু হতে পারে। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে কবে

পৃথিবীটা দুম্‌ করে ফেটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে সেই সুদূর পরাহত আশঙ্কায় আত্মহত্যা ক'রে বসাটা যেমন অহেতুক ঠিক তেমনি অহেতুক এই সব ভবিষ্যদ্বাণী করা।

তা সত্বেও অবশ্য বলা হচ্ছে যে শ্রীমান স্থ ওয়েনের "তৃতীয় পক্ষের" লেখকরা ভবিষ্যতে প্রতিশোধমূলক ঘটনা ঘটতে পারে এই ভয়ে "কলম নামিয়ে রেখেছেন"। কিন্তু এখনো পর্যন্ত যার সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা অবধি নেই, সেই রকম একটা মন-গড়া অমঙ্গলের কথা ভেবে তারা কি এমন কাজ করতে পারে? "জীবন দিয়ে যারা সাহিত্যকে আঁকড়ে ধরেছে" তাদের আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা কী তবে এতই সামান্য? ভবিষ্যতে কোন একদিন সামাজিক শাসানি খেতে হতে পারে বলে প্রেমিক-প্রেমিকা যুগল কি তবে আলিঙ্গনাবদ্ধ হতেও ভয় পাবে?

সত্য কথাটা এই যে বামপন্থী সমালোচনা বড় কঠোর বলেই যে "তৃতীয় পক্ষ" "কলম্‌ নামিয়ে রেখেছেন", একথা ঠিক নয়। আসলে কারণটা হল "তৃতীয় পক্ষ" বলে কিছু থাকতেই পারে না। আর তাই যদি হয়, এমন কোন লোক যদি নাই থাকে, তাহলে নিশ্চয় তাদের কলমও থাকতে পারে না। কাজেই কলম্‌ নামিয়ে রাখার প্রশ্নই ওঠে না।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বাস করেও একজন লেখক শ্রেণীর ঊর্ধ্বে উঠতে পারবে, যুদ্ধের সময়েও যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ ক'রে একা দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে, আর এ কালের বাসিন্দা হয়েও ভবিষ্যতের জন্যে লিখতে পারবে—এ সবই আগাগোড়া কল্পনাবিলাস। বাস্তবের জগতে এ ধরনের কোন লোক নেই। এ ধরনের একজন হবার জন্যে চেষ্টা করাও যা নিজের কান টেনে নিজেকে মাটি থেকে শূন্যে তুলে ধরার চেষ্টা করাও তাই—অসম্ভব ব্যাপার। রেগে টঙ হয়েও কোন লাভ নেই কারণ অন্যেরা মাথা নাড়ছে বলেই যে আপনি নিজের চুল টানা বন্ধ করেছেন তা তো নয়।

কাজেই এই "তৃতীয় পক্ষ" পর্যন্ত শ্রেণীর ঊর্দ্ধে উঠতে পারে না। শ্রীমান স্থ ওয়েন স্বয়ং যখন শ্রেণী সমালোচনার আশঙ্কা করছেন তখন শ্রেণী স্বার্থের সংস্রব ত্যাগ করে কোন সাহিত্য সৃষ্টি করা কী সম্ভব? না—সাহিত্যের পক্ষে সংগ্রামের পথ থেকে সরে আসাটা অবধি অসম্ভব। শ্রীমান স্থ প্রথমেই "তৃতীয় পক্ষের" হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, অথচ তিনি "প্রতিবাদ জানানোর" দোষে দোষী হ'তে চান না। কিন্তু বর্তমানকে

কারুর পক্ষেই ডিঙিয়ে পার হওয়া সম্ভব নয় তাই যেই তিনি আগামীকালের মানুষদের জন্যে শ্রেণী স্বার্থের সংশ্রব শূন্য সাহিত্য সৃষ্টি করতে যান অমনি তাঁকে বামপন্থী সমালোচনার ভয় বিব্রত করতে শুরু করে।

সত্যিই এটা একটা অস্বস্তিকর অবস্থা। এমনটা হবার কারণ এই যে স্বপ্ন কখনো সত্যি হতে পারে না। ব্যাপারটাকে জটিল করে তোলার জন্যে বামপন্থী সাহিত্য যদি আদৌ নাই থাকতো, তাহলে আর "তৃতীয় পক্ষ"ও থাকতো না, "তৃতীয় পক্ষের" সাহিত্য তো আরো দূরের কথা। শ্রীমান স্ ওয়েন কিন্তু একটা স্বেচ্ছাচারী প্রকৃতির বামপন্থী সাহিত্যের স্বপ্ন দেখেছেন যা তাঁর মনগড়া "তৃতীয় পক্ষের" আবির্ভাব ও আগামী দিনের সাহিত্যের জন্মে বাধা দিচ্ছে। সব অপরাধ চড়ানো হয়েছে বামপন্থী সাহিত্যেরই ঘাড়ে!

এটা মানতেই হবে যে বামপন্থী সাহিত্যিকরা এমন কিছু আহামরি ধরনের নয়। তাঁরা চিত্র-কাহিনী লেখেন এবং গীতিনাট্যের জন্যে খসড়া রচনা করেন। তা বলে কিন্তু শ্রীমান স্ ওয়েন তাঁদের যতটা অপদার্থ মনে করছেন তা তাঁরা নন, তাঁরা টলস্টয় ও ফ্লবেয়ারকেও চান বইকি। অবশ্য সেই সব টলস্টয় ও ফ্লবেয়ারকে তাঁরা চান না যারা "কেবল আগামী দিনের মানুষের জন্যে লিখবেন বলে তোড়জোড় করছেন" (কারণ এখনকার কেউই এদের লেখা পড়বেন না)। টলস্টয় ও ফ্লবেয়ার তাঁদের দিনের মানুষদের জন্যেই লিখেছিলেন। ভবিষ্যতে কি হবে সেটা বর্তমানেই নির্ধারিত হয়ে যায় এবং বর্তমানে যেসব জিনিষের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে একমাত্র সেগুলোই ভবিষ্যতে দরকার হবে। বিশেষ করে টলস্টয় কৃষকদের জন্যে গল্প লিখেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেকে "তৃতীয় পক্ষের" একজন বলে কায়দা দেখান নি এবং বুর্জোয়াদের শত আক্রমণেও তাঁর কলম নামিয়ে রাখেন নি। স্ ওয়েন অবশ্য বলেছেন "বামপন্থীরা" এত বোকা নয় যে একথা জানে না যে চিত্র-কাহিনীর বই থেকে টলস্টয় বা ফ্লবেয়ার জন্মাতে পারে না। বামপন্থীরা কিন্তু সত্যিই মনে করে যে এর থেকেই মাইকেল এঞ্জেলো বা লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চির মতো মহান চিত্রশিল্পীর জন্ম হতে পারে। আর আমি বিশ্বাস করি যে গীতিনাট্যের পাণ্ডুলিপিগুলো থেকেই টলস্টয় বা ফ্লবেয়ার জন্মাতে পারেন। আজ কেউ মাইকেল এঞ্জেলোর ছবির বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করে না কিন্তু আসলে কি এগুলো ধর্মীয় প্রচার এবং 'ওল্ড টেস্টামেন্টের'

কাহিনী-চিত্র নয়? তাছাড়া এ সবই কিন্তু শিল্পী তাঁর সমকালীন মানুষের জন্যেই সৃষ্টি করেছিলেন।

সংক্ষেপে এই দাঁড়ায় যে শ্রীমান সু ওয়েন যখন বলছেন যে লোক ঠকানো বা মিথ্যে রঙ চড়িয়ে বাহার দেখানোর চেয়ে "তৃতীয় পক্ষের" উচিত লেখার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করা, তখন তিনি কিছু ভুল বলেন নি।

এমন কী উনি আরো দৃঢ় ভাবে এই অতি সত্য ঘোষণা করেছেন: "সাহস ভরে কোন কাজে হাত লাগানোর আগে দেখতে হবে নিজের ওপর বিশ্বাস রাখার মতো সাহস আছে কি না!"

এত কথার পরেও কিন্তু শ্রীমান সু ওয়েন বলছেন যে পাছে বামপন্থী তাত্ত্বিকরা তাদের সমালোচনা করে এই ভয়ে "তৃতীয় পক্ষের" বহু ছোট বড় সদস্যই তাদের কলম নামিয়ে রেখেছেন!

"অতঃ কিম্?"

তৃতীয় পক্ষ সম্বন্ধে আরো কিছু কথা

(অংশ বিশেষ)

একেবারে প্রথমে তৃতীয় পক্ষ বলতে সেই সব লোকেদের বোঝাত যারা দুই বিরোধী শিবির বা যুদ্ধরত ক ও খ'য়ের কারুর সঙ্গেই যোগ দিত না। আসলে কিন্তু এ রকম কোন লোক থাকতে পারে না। মানুষ হয় মোটা নয় রোগা। তত্ত্বের দিক্ দিয়ে আরেক ধরনের লোক থাকা উচিত যারা এর কোনটিই নয়, কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। একটা তুলনা করতে গেলেই দেখা যায় যে লোকটি হয় কিঞ্চিৎ মোটা নয় কিঞ্চিৎ রোগা। শিল্প জগতের তৃতীয় পক্ষ সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। কোন কোন শিল্পীকে নিরপেক্ষ বা কোন বিশেষ আদর্শের প্রবক্তা নয় বলে মনে হলেও তারা সর্বদাই হয় এদিকে নয় ওদিকে একটু না একটু ঝুঁকে থাকবেই। সাধারণ অবস্থায় ইচ্ছা করেই হোক বা অন্য কোন ভাবেই হোক তারা এই ঝোঁকটাকে লুকিয়ে রাখতে পারে কিন্তু সংকটের দিনে তারা এটিকে পরিষ্কার ভাবে চক্ষুগোচর করাবেই। এই জন্যেই জিদ্ তাঁর বামপন্থী ঝোঁকগুলো দেখিয়েছেন

এবং অন্য লোকেও হয়তো দ্রেফ দু'চারটে কথার মধ্যেই নিজেদের উদ্ঘাটিত করে ফেলবেন। এই মিশ্র প্রকৃতির ভিড়ের মাঝ থেকে অনেকে হয়তো তাই দেখবো বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং সম্মিলিত স্বরে সজোরে নিনাদ করছেন। আবার কেউ হয়তো এই সুযোগে বিপ্লবকে আঘাত করতে, দুর্বল করে দিতে বা তার বিকৃতি ঘটাতে চাইবে। বামপন্থী তাত্ত্বিকদের ওপরেই তাই এদের বিশ্লেষণ করার দায়িত্ব রয়েছে।

এটা যদি যুদ্ধবাজ প্রভুদের মধ্যে "গৃহযুদ্ধের" সমতুল্য হয় তাহলে বামপন্থী তাত্ত্বিকদের অবশ্য কর্তব্য হবে এই "গৃহযুদ্ধ" চালিয়ে যাওয়া, দুই শিবিরের মধ্যে স্পষ্ট ভেদরেখা টানা এবং তাঁদের পিছন থেকে যেসব বিষাক্ত তীর ছোঁড়া হয়েছে সেগুলিকে উৎপাটন করা। •

"আমাদের বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশীদের আতঙ্কিত করা" সম্বন্ধে

যাদের বিন্দুমাত্র বোধশক্তি আছে তারাই জানে যে ছাত্ররা সম্প্রতি যে আবেদনপত্র পেশ করেছিল তার কারণ জাপান লিয়াওনিঙ ও কিরিন দখল করে নিয়েছে অথচ নানকিঙ সরকার সেই অসহায়ের মতো তাকিয়ে রয়েছে। লীগ অফ নেশন্স জাপানের পক্ষে কিন্তু তবু তারই কাছে একটি আবেদন করেই নানকিঙ সরকার খালাস। ওরা বলছে পড়াশোনা নিয়ে থাকো। হ্যাঁ, ছাত্রদের পড়াশোনা করাই উচিত। কিন্তু বড় বড় চাঁইরা যখন আমাদের ভূখণ্ড অন্যের হাতে তুলে দিচ্ছে তখন শান্ত মনে তারা পড়াশোনা করে কী করে? আমরা কাগজে দেখেছি উত্তর-পূর্ব বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, ফেঙ ইয়ঙ বিশ্ববিদ্যালয়েরও একই হাল এবং জাপানী সৈন্যরা ছাত্র বলে মনে হলেই যার-তার ওপর গুলি চালাচ্ছে। আবেদনপত্র পাঠাতে হবে বলে বইয়ের থলি নামিয়ে রাখাটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত করুণ ব্যাপার। তবু ১৮ই ডিসেম্বর কুয়োমিন্টাঙ সরকার সামরিক ও বেসামরিক যাবতীয় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে ছাত্রদের বিরুদ্ধে এই দোষারোপ করেছে যে তারা "সংগঠন ধ্বংস করে, যানবাহন চলাচল রোধ

করে, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের আক্রমণ করে, গাড়ি কেড়ে নিয়ে, পথিক ও সরকারী কর্মচারীদের আক্রমণ করে এবং নিজেদের হাতে আইন তুলে নিয়ে শান্তিভঙ্গ করেছে।" এটা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এর ফলে নিশ্চয় "আমাদের বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশীরা আতঙ্কিত হবেন। এ রকম চলতে থাকলে দেশটা উচ্ছন্নে যাবে!"

এরা ভারী সুন্দর "বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশী"! সাম্রাজ্যবাদী জাপানের সৈন্যদল যখন লিয়াওনিঙ ও কিরিন দখল করে নেয় আর সরকারী অফিসে বোমা বর্ষণ করে তখন এরা আতঙ্কিত হয় না। এই সৈন্যদল যখন রেললাইন উপড়ে ফেলে যাত্রীবাহী ট্রেন উড়িয়ে দেয়, কর্মচারীদের গ্রেপ্তার করে আর জনসাধারণকে গুলি করে এরা তখন আতঙ্কিত হয় না। বছরের পর বছর গৃহযুদ্ধ বা ভয়াবহ বন্যা দেখে, প্রচণ্ড দারিদ্র্যে শিশু বিক্রী হতে দেখে, ছিন্নমস্তকের প্রদর্শনী, গোপন হত্যাকাণ্ড বা কুয়োমিন্টাঙের নির্দেশে বৈদ্যুতিক শিহরণ প্রয়োগ ক'রে স্বীকারোক্তি আদায় করা হচ্ছে দেখেও এরা আতঙ্কিত হয় না। কিন্তু ছাত্ররা যেই প্রতিবাদে একবার কণ্ঠ চড়ায় অমনি তারা আতঙ্কিত হয়।

এরা কুয়োমিন্টাঙের ভারী সুন্দর "বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশী"! বেজন্মার দল!

এমন কী যেসব অভিযোগ করা হয়েছে তা যদি সত্যিও হয় তো বলব এ রকম ঘটনা সমস্ত "মিত্র রাজ্যেই" ঘটে। ওরা নিজেদের "আইন-কানুন" রক্ষা করার জন্যে যেসব জেলখানা ব্যবহার করে সেগুলোই ওদের মুখ থেকে "সংস্কৃতির" মুখোশখানা ফালাফালা করে দিয়েছে। কী আস্পর্ধা যে আতঙ্কিত হবার কথা বলে!

কিন্তু যেই আমাদের "বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশীরা" আতঙ্কিত হয়ে ওঠে আমাদের সরকার অম্‌নি কাঁপতে শুরু করে। "এরকম যদি চলতে থাকে তাহলে দেশটা উচ্ছন্নে যাবে!" আপাত ভাবে উত্তর-পূর্ব সীমান্তের তিনটি জেলা হারিয়ে কুয়োমিনটাঙ চীনকে এখন আগের চেয়ে বেশী করে একটা 'দেশ' বলে মনে হচ্ছে। জেলা ক'টি হারাবার সময় কেউ টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করেনি, কেবল গুটিকয়েক ছাত্র আবেদনপত্র পেশ করেছিল এবং চীনকে এখন আগের চেয়ে বেশী মাত্রায় একটা দেশ বলে মনে হচ্ছে বলে তার জন্যে কুয়োমিনটাঙ আমাদের "বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশীর" প্রশংসা অর্জন করেছিল। এই "দেশটি" যেন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়!

এই সংক্ষিপ্ত টেলিগ্রামটি থেকেই আমাদের সরকার ও আমাদের "বন্ধুভাবাপন্ন

প্রতিবেশী"র চরিত্রটি একেবারে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। আমাদের "বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশী" চায় যে তারা যখন আমাদের গায়ের থেকে মাংস ছিঁড়ে নেবে তখনো আমরা কোন শব্দ করব না। আমরা যদি সামান্যতম অনধিকার প্রবেশ করি ওরা আমাদের জবাই ক'রে ছাড়ে। এর পরেও কুয়োমিনটাঙ চায় যে আমরা আমাদের "বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশীদের" ইচ্ছানুযায়ী চলি, নচেৎ যাবতীয় সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে টেলিগ্রাম যাবে: "অতি অবশ্য জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা চাই। গণ্ডগোল থামাতে পারছে না এই অজুহাতে কেউ যেন নিজের দায়িত্ব এড়াতে না চায়।"

আমাদের "বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশীরা" জানে যে জাপানী সৈন্যদের রোখা যাবে না, কিন্তু ছাত্রদের রুখতে না পারার আর কী আছে? এই যে আপনারা—"সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষ", আপনারা আপনাদের প্রতি মাসের একশো আঠার লক্ষ ডলার পরিমাণ সামরিক বরাদ্দের আর চল্লিশ লক্ষ ডলার পরিমাণ প্রশাসনিক বরাদ্দের কী সদ্‌ব্যবহারটা করছেন শুনি?

এইটা লেখার একদিন বাদেই একুশে তারিখের 'শান পাও'-এ নানকিঙ থেকে প্রেরিত এই টেলিগ্রামটি পড়লাম: "খবর পাওয়া গেছে এগজামিনেশান ইউয়ানের চাঙ ই-কুয়ানকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং আজ থেকে দু'দিন আগে তিনি ছাত্রদের হাতে অত্যন্ত নিগৃহীত হয়েছেন। স্বয়ং চাঙ কিন্তু বলেছেন যে তাঁর ড্রাইভারের একটা ভুলের জন্যে তাঁকে জনতার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজির করা হয় কিন্তু তিনি নিজেকে এর মধ্যে থেকে মুক্ত করে নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসেন। 'কার্যনির্বাহক ইউয়ানের' একজন সেক্রেটারীকেও কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিন্তু তিনিও সরাসরি চলে এসেছেন—উধাও হয়ে যাননি।"

সাংহাইয়ের কয়েকটি স্কুলের যেসব ছাত্র নানকিঙে আবেদনপত্র পেশ করতে গেছল তাদের মধ্যে কত হতাহত হয়েছে তারই একটি বিশ্বাসযোগ্য পরিসংখ্যান আবার দেওয়া হয়েছে "শিক্ষার জগত" শীর্ষক কলামে। "চীনা পাবলিক স্কুলের দু'জন মারা গেছে আর তিরিশজন আহত হয়েছে। ফুটান বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে দু'জন ফুটান মিডল্‌ স্কুলের দশজন প্রাণ হারিয়েছে। পূর্ব এশিয়া মিডল্‌ স্কুলের একজনকে (ছাত্রী) খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সাংহাই মিডল্‌ স্কুলের একজন নিখোঁজ আর তিনজন আহত। ভিনসেন্ট স্কুলের একজন নিহত আর পাঁচজন আহত..."

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে সরকারী টেলিগ্রামের অভিযোগ অনুযায়ী ছাত্ররা কিন্তু "শান্তি বিঘ্নিত" করেনি। তা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ কিন্তু তাদের দমন করেছে, তা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়েছে, তাদের জবাই করেছে। আমাদের "বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশীরা" ভবিষ্যতে আর আতঙ্কিত হবেন না। তাঁরা খুশী মনে লুঠের মাল ভাগ করতে আসতে পারবেন।

বামপন্থী সাহিত্য সংঘ সম্বন্ধে

১৯৩০ সালের মার্চ বামপন্থী সাহিত্য সংঘের উদ্বোধন কালে প্রদত্ত বক্তৃতা—

অন্য বক্তারা যেসব বিষয় নিয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করেছেন সে সম্বন্ধে আর আমার কিছু বলার দরকার নেই। আমার মতে এ কালের "বামপন্থী লেখকরা" খুব সহজেই "দক্ষিণপন্থী লেখক" হয়ে পড়তে পারেন। প্রথমতঃ লেখবার বা পড়াশোনা করবার জন্য আপনি যদি সত্যিকার সামাজিক সংঘাতগুলো সম্বন্ধে অবহিত না হয়ে নিজেকে স্রেফ কাচের জানলার পিছনে আটকে রাখেন তাহলে আপনি খুব সহজেই অত্যন্ত প্রগতিবাদী বা "বামপন্থী" হতে পারবেন, কিন্তু যে মুহূর্তে আপনি বাস্তবের সম্মুখীন হবেন আপনার সব চিন্তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। বন্ধ দরজার ভিতরে খুব সহজেই প্রগতিবাদী চিন্তা অঙ্কুরিত হয় বটে কিন্তু আবার ঠিক তেমনি সহজ ভাবেই "দক্ষিণপন্থী" হয়ে পড়ার সম্ভাবনাটাও থাকে। পশ্চিম দেশে একেই বলে "সাঁলো সমাজতন্ত্রী"। সাঁলো একটি বসবার ঘর। এখানে বসে সমাজতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করা অথচ সমাজতন্ত্রকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করার এই ব্যাপারটা রুচি ও শিল্পবোধের পরিচয় দেয়। এ ধরনের সমাজতন্ত্রীরা একেবারেই আস্থাভাজন নয়। মুসোলিনি পেশাদার লেখক নয় তাই তাকে বাদ দিলে এমন একজন লেখক বা শিল্পীকে পাওয়া সত্যিই আজ খুব শক্ত যার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার রেশ-লেশ নেই, যার মতে শ্রমিক ও কৃষকদের কারারুদ্ধ করা, হত্যা করা এবং শোষণ করাই উচিত। (অবশ্য একজনও নেই একথা বলা যায় না, কারণ চীনের ক্রিসেন্ট মুন গোষ্ঠী এবং ওই মুসোলিনির প্রিয় লেখক দ' আনুনজিওর উদাহরণ সামনেই রয়েছে।)

দ্বিতীয়তঃ, আপনি যদি বিপ্লবের প্রকৃত চরিত্রটি বুঝতে না পারেন তাহলেও খুব সহজেই "দক্ষিণপন্থী" হয়ে পড়া সম্ভব। বিপ্লব রক্ত আর

নোওরা মেশানো জটিল একটা ব্যাপার। বিপ্লব কবি-কল্পনার মতো সুন্দর বা নিখুঁত নয়। বিপ্লব একেবারে রূঢ় বাস্তব, যার জন্য এমন অনেক ছোটখাটো ও ক্লান্তিকর কাজ করতে হয় যা কবি-কল্পনার মতো রোমান্টিক নয়। বিপ্লবের সময় ধ্বংসমূলক কাজ হবেই কিন্তু নির্মাণমূলক কাজ বিপ্লবের পক্ষে আরো বেশী প্রয়োজন। তাছাড়া ধ্বংস করা সহজ কিন্তু নির্মাণ করা কষ্টকর। তাই আজ যাদের বিপ্লব সম্বন্ধে রোমান্টিক স্বপ্ন রয়েছে তারা যখন বিপ্লবের আরো ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করবে বা যখন সত্যিই বিপ্লব শুরু হবে তখন খুব সহজেই তাদের মোহভঙ্গ হতে পারে। শোনা যায় রুশ কবি ইয়েসেনিন প্রথমে সর্বান্তঃকরণে অক্টোবর বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তিনি সরবে ঘোষণা করেছিলেন: "স্বর্গ ও মর্তে বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!…আমি একজন বলশেভিক।" পরে কিন্তু যখন বাস্তব অবস্থাটি তাঁর কল্পনার সঙ্গে মিলল না অমনি তার মোহভঙ্গ ঘটতে শুরু হল। তিনি শেষ পর্যন্ত অবক্ষয়ের গ্রাস হলেন। পরবর্তী কালে তিনি আত্মহত্যা করেন এবং শোনা যায় তার অন্যতম কারণও এই মোহভঙ্গ। পিলনায়েক ও এরেনবুর্গেরও এই একই অবস্থা। আমরাও আমাদের ১৯১১-র বিপ্লবের সময়ে একই উদাহরণ দেখেছি। 'দক্ষিণ সমিতি'র লেখকদের মতো যারা অতি বিপ্লবী হিসেবে কাজ শুরু করেছিল তারা কিন্তু মনে মনে এই অলীক আশা পুষে রেখেছিল যে একবার মাঞ্চুদের তাড়িয়ে দিতে পারলেই "পুরোনো সেই সুখের দিনে" ফিরে যেতে পারবে, সকলেই তখন ঢোলা হাতা জামা, সুউচ্চ টুপি আর চওড়া বেল্ট পরতে পারবে আর রাজকীয় চালে চলে ফিরে বেড়াবে। এই জন্যেই মাঞ্চু সম্রাট বিতাড়িত হবার পর যখন রিপাবলিক পত্তন হল, ওরা একেবারে অবাক হয়ে দেখল যে যা ঘটছে তা সবই অন্য ধারা। ফলতঃ ওদের স্বপ্নভঙ্গ হল এবং ওদের কেউ কেউ নতুন আন্দোলনের বিরোধিতা পর্যন্ত করল। আমরা যদি বিপ্লবের প্রকৃত চরিত্রটি না বুঝি, আমরাও খুব সহজেই এই রকম করে বসতে পারি।

আরেকটি ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে কবি বা লেখকদের উচ্চশ্রেণীর মানুষ বলে মনে করা, আর তাদের কাজগুলো অন্য সব কাজের চেয়ে মহৎ বলে ভাবা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে হাইনে মনে করতেন কবিরা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মহান, আর ভগবান অসীম ন্যায়পরায়ণ। তাই তাঁর মতে কবিরা মৃত্যুর পর ভগবানের পাশে আসন গ্রহণ করে এবং ভগবান তাদের মিষ্টিমুখ করান।

আজকাল অবশ্য কেউই ভগবানের মিষ্টিমুখ করানোর কথা বিশ্বাস করে না, কিন্তু কিছু লোকে এখনো বিশ্বাস করে যে আজ যে কবি ও লেখকরা শ্রমিকদের বিপ্লব সমর্থন করছে তারাই কাল বিপ্লব সমাধা হবার পর শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে প্রভূত পরিমাণে পুরস্কার লাভ করবে, বিশেষ ভাবে আপ্যায়িত হবে, বিশেষ ধরনের গাড়িতে চড়ে বেড়াবে, বিশেষ ধরনের খাবার খাবে। শ্রমিকরা নাকি তাদের রুটি মাখন খেতে দিয়ে বলবে, "এই নাও, তোমরাই তো আমাদের কবি!" এটা আরেক বিভ্রম এ কথনোই হতে পারে না। বিপ্লবের পর অবস্থা হয়তো এখনকার চেয়ে আরো ঘোরালো হয়ে উঠবে। রুটি মাখন তো দূরের কথা, কালো রুটিও হয়তো নাও পাওয়া যেতে পারে। রুশ বিপ্লবের পর দু'এক বছর এরকমই হয়েছিল। এই সত্যটা উপলব্ধি করতে না পারলে আমরা খুব সহজেই "দক্ষিণপন্থী" হয়ে পড়তে পারি। ঘটনাটা এই যে শ্রীমান লিয়াঙ শি-চিউ যাদের "যোগ্য" বলে মনে করেন সেই ধরনের লোক ছাড়া শ্রমিকদের কেউই বুদ্ধিজীবীদের জন্য স্বতন্ত্র কোন শ্রদ্ধা অনুভব করে না। 'উনিশ' নামে ফাদায়েভের যে উপন্যাসটি আমি অনুবাদ করেছি তারই একটি চরিত্র 'মেটিক'কে দেখুন না। এই বুদ্ধিজীবী মেটিককে নিয়ে খনি শ্রমিকেরা হামেশাই ঠাট্টা-তামাশা করতো। বলাই বাহুল্য যে বুদ্ধিজীবীদেরও নিজস্ব কাজ আছে এবং তা আমরা কখনোই ছোট করে দেখবো না। তা বলে কবি ও লেখকদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করাটা মোটেই শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য নয়। এবার আমি কয়েকটা বিষয়ের উল্লেখ করছি যার ওপর আমাদের নজর দেওয়া উচিত।

প্রথমতঃ প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা ও প্রাচীন শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের কঠোর ভাবে একটানা' সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে এবং আমাদের যে ক্ষমতা আছে তার পুরো সদ্ব্যবহার করতে হবে। পুরোনো সমাজের শেকড়গুলো বহু গভীর অবধি বিস্তৃত থাকে তাই আমাদের আন্দোলন যদি সে রকম জোরদার না হয় এগুলোকে নড়ানো যাবে না। তাছাড়া আমাদের পুরোনো সমাজ এমন অনেক কায়দা জানে যার ফলে আমাদের নবীন শক্তিকে সে আপোষ করিয়ে ছাড়ে কিন্তু নিজে কখনোই আপোষ করে না। চীনে বহু নব আন্দোলন হয়েছে কিন্তু তার প্রতিটিই প্রাচীনের কুক্ষীগত হয়েছে।' এটা হবার সবচেয়ে বড় কারণ এই যে এইসব আন্দোলনের নির্দিষ্ট কোন সাধারণ লক্ষ্য ছিল না, এদের দাবীগুলো ছিল অত্যন্ত মামুলি এবং এরা অতি সহজেই

তৃপ্ত হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের উদাহরণটাই ধরুন না। পুরোনো সমাজের রক্ষকরা প্রথম দিকে এটির বিরোধিতাই করেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু তারা সহজ ভাষায় লেখবার অনুমতি দিল। অতি হীন গোছের একটি পদমর্যাদা প্রদান ক'রে সহজ ভাষায় লেখা প্রবন্ধকে তারা খবর কাগজের অবহেলিত অংশগুলিতে ছাপবার অনুমতি দিল। এই নতুন জিনিষটি আদৌ ক্ষতিকারক নয় বলে মনে হয়েছিল বলেই ওরা এটিকে টিকিয়ে রাখতে দিয়েছিল। ওদিকে নবীন শক্তিও সহজ ভাষা চালু করা গেছে ভেবে সন্তুষ্ট হয়েছিল। গত ক'বছরের প্রলেতারীয় সাহিত্য আন্দোলনেরও প্রায় এই একই দশা। প্রাচীন সমাজ শ্রমিকশ্রেণীর রচনাকে সহ্য করে নিয়েছে কারণ এটি তাদের কোন ভীতির কারণ হচ্ছে না। বস্তুত প্রাচীন সমাজের লোকেরা এই ধরনের সাহিত্য প্রণয়নে হাত লাগাতেও কসুর করেনি। বসবার ঘরের পুরোনো দিনের পোরসিলিনের জিনিষের পাশে একজন শ্রমিকের একটা সাদামাটা খাবার বাটি সাজিয়ে রাখার মধ্যে একটা নতুনত্ব আছে বলেই প্রলেতারীয় সাহিত্যকে ওরা অলঙ্কারের মতো ব্যবহার করেছে। ওদিকে আবার শ্রমিকশ্রেণীর লেখকরা যেই সাহিত্যে জগতের মধ্যে ছোট্ট একটা অংশ গ্রহণ করতে পায় এবং নিজেদের পাণ্ডুলিপি বিক্রি হচ্ছে দ্যাখে তারা তাদের সংগ্রাম বন্ধ করে দেয়। তাদের তাত্বিক বন্ধুরাও অমনি বিজয়গীতি ধরেন: "প্রলেতারীয় সাহিত্য জয়লাভ করেছে।" কিন্তু গুটিকয়েক ব্যক্তির সাফল্যের কথা বাদ দিলে স্বয়ং প্রলেতারীয় সাহিত্য কী অর্জন করেছে? মুক্তি অর্জনের জন্য যে প্রলেতারীয় সংগ্রাম চলেছে তারই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে হবে প্রলেতারীয় সাহিত্যকে। শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রলেতারীয় সাহিত্যও সমান তালে গড়ে উঠবে। সাহিত্য জগতে প্রলেতারীয় সাহিত্যের উচ্চ সম্মান আর সামাজিক ভাবে প্রলেতারীয়দের হীন পদমর্যাদা দেখে এটাই স্পষ্ট বোঝা যায় যে প্রলেতারীয় সাহিত্য প্রলেতারীয়দের সংশ্রব হারিয়ে প্রাচীন সমাজের দিকে চলে গেছে।

দ্বিতীয়তঃ, আমার মতে আমাদের রণক্ষেত্রের সম্মুখ ভাগ আরো প্রসারিত করা দরকার। গত বছর ও তার আগের বছর সত্যিই আমরা বেশ কয়েকবার সাহিত্য জগতে লড়াই করেছি। কিন্তু তার পরিসর ছিল খুবই সঙ্কীর্ণ। প্রাচীন সাহিত্য ও প্রাচীন চিন্তাধারা সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছুই না করে আমাদের নবীন লেখকরা একই জায়গায় কেবল কলম

ঘসতে শুরু করেন আর প্রাচীন পন্থীরাও সেই সুযোগে আরামে একপাশে দাঁড়িয়ে কী ঘটছে দেখে যান।

তৃতীয়তঃ, আমরা এখন সংখ্যায় এত নগণ্য যে আমাদের অতি অবশ্য অসংখ্য নবীন যোদ্ধা তৈরী করা উচিত। আমাদের কয়েকটা পত্রিকা আছে এবং বেশ কিছু বইও প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু এসবের পিছনেই সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাহিত্যিক আছেন। তাই বিষয়বস্তুর মধ্যেও বৈচিত্র্য নেই। কেউই বিশেষজ্ঞ হবার চেষ্টা করছেন না, সবাই সব কাজ করছেন—অনুবাদ, গল্প লেখা, সমালোচনা, কবিতাও বাদ নেই। বলাই বাহুল্য এর ফল খারাপই হচ্ছে। লেখকের সংখ্যা কম বলেই এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। লেখকের অভাব না থাকলে অনুবাদকরা অনুবাদ নিয়ে থাকতে পারেন, গল্পকাররা গল্প নিয়ে, সমালোচক সমালোচনা নিয়ে। সেক্ষেত্রে শত্রুর সঙ্গে সমরে নামার পর আমাদের বাহিনীর ক্ষমতা এত বেশী হবে যে শত্রুকে সহজেই পরাস্ত করা যাবে। প্রসঙ্গতঃ একটা উদাহরণ দিচ্ছি। গত বছরের আগের বছর ক্রিয়েশান সোসাইটি ও সান্ সোসাইটি আমাকে আক্রমণ করেছিল। সত্যিই ওরা তখন এত দুর্বল ছিল যে আমিও কিছুদিন পরে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলাম। পাল্টা আক্রমণ চালানোর কোন হেতুই খুঁজে পাইনি কারণ এটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ওরা "শূন্য শহরের কৌশল"* ব্যবহার করছে। শত্রুদল সৈন্যদের প্যারেড না করিয়ে তার বদলে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল একটা সোরগোল তুলতে। আমাকে গালিগালাজ করে বেশ কিছু নিবন্ধ লেখা হলেও এটা বুঝতে আপনাদের এক মুহূর্তও লাগতো না যে এগুলো সবই ছদ্মনামে লেখা হয়েছিল। ঘুরেফিরে শেষ পর্যন্ত এইসব গালিগালাজের সারমর্ম যা দাঁড়াতো তা সবই প্রায় এক। আমি এমন একজনের আক্রমণের জন্য তখন অপেক্ষা করছিলাম যে সমালোচনার মার্ক্সবাদী পদ্ধতিটি আয়ত্ত করেছে। কিন্তু এরকম কোন লোক আত্মপ্রকাশ করেনি। আমি চিরকালই মনে করেছি যে তরুণ যোদ্ধাদের ট্রেনিং দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং সেই জন্যই

---

* থ্রি কিংডমস্-এর কালের খ্যাতনামা রণকৌশলবিদ চুকো লিয়াঙ শোনা যায় শত্রুসৈন্যকে একটা অসুরক্ষিত শহরের মধ্যে ঢোকবার জন্য আহ্বান করেন। শত্রুদল ফাঁদে পড়ার আশঙ্কায় শহরে ঢোকে না।

কয়েকটি সাহিত্য গোষ্ঠীও গড়ে তুলেছি। এর মধ্যে কোনটাই অবশ্য তেমন কিছু করতে পারেনি। কিন্তু এ ব্যাপারে ভবিষ্যতে আমাদের আরো নজর দেওয়া উচিত।

এখন আমাদের যেমন অত্যন্ত জরুরী কাজ হচ্ছে একদল নতুন যোদ্ধা তৈরী করা তেমনি আমরা যারা সাহিত্য ফ্রণ্টে রয়েছি তাদেরও "স্থিতিস্থাপক" হতে হবে। স্থিতিস্থাপক মানে কিন্তু চিঙ রাজবংশের সময়কার সেইসব বিদ্যার্থীর কথা বলছি না যারা পরীক্ষা* দেবার সময় রচনাগুলোকে "দরজা খোলার জন্য এক একটা ইট"-এর মতো ব্যবহার করতো। বিদ্যার্থীরা এই রচনাগুলোর সাহায্যেই পরীক্ষায় পাশ করে চিঙ রাজত্বের এক একজন পদস্থ কর্মচারী হতো। একবার যদি কেউ এই "ভূমিকা, বিবরণ, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ও ভাষ্য"-র* জোরে পরীক্ষায় উতরে যেতো আর তাকে জীবনে কোনদিন এটি ব্যবহার করতে হতো না, সে এটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারতো। এই জন্যেই একে "ইট" বলা হত, কারণ এটা শুধু দরজা খোলবার জন্যেই ব্যবহার করা হত এবং সে কাজটা হয়ে গেলে ইটাকে বয়ে বেড়ানোর বদলে এক ধারে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াটাই ছিল যুক্তিযুক্ত। একই ধরনের পদ্ধতি এখনো ব্যবহৃত হয়। আমরা দেখেছি যে দু'একটা কবিতার বই বা গল্পের বই প্রকাশিত হবার পরেই লেখক মশায় অনেক সময় একেবারে চিরতরে উধাও হয়ে যায়। এরা যায় কোথায়? কয়েকটা বই ছেপে কম হ'ক বেশী হ'ক খানিকটা খ্যাতি অর্জন করে এরা তারপর অধ্যাপক হয়ে যায় বা অন্য কোন কাজ পেয়ে যায়। এদের নাম কেনা হয়ে গেছে বলে আর লেখার দরকার হয় না এবং এরা তখন চিরতরে উধাও হয়ে যায়। এই জন্যেই চীন সাহিত্য ও বিজ্ঞানে তেমন কিছুই দিতে পারছে না। আমাদের কিন্তু এখন কাজে লাগবার মতো কিছু কিছু লেখার খুবই প্রয়োজন। (লুনাচার্স্কী রুশ হস্তশিল্প সংরক্ষণের প্রস্তাব পর্যন্ত করেছিলেন কারণ বিদেশীরা কৃষকদের তৈরী জিনিষপত্র কিনবেই এবং এই টাকাটা কাজে লাগবে। আমার বিশ্বাস আমরা যদি সাহিত্য ও বিজ্ঞানে কিছু অবদান রাখতে পারি তাহলে সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে আমাদের মুক্ত করার জন্য যে রাজনৈতিক আন্দোলন চলছে এসব তার সহায়কই

* এ ধরনের রচনায় চারটি মূল অধ্যায়।

হবে।) সাহিত্যে সামান্যতম সাফল্য অর্জন করতে হলেও আমাদের কিন্তু "স্থিতিস্থাপক" হতে হবে।

আমার শেষ কথা, আমার মতে একটা যুক্তফ্রন্ট মানেই আমাদের নিজেদের মধ্যে অতিঅবশ্য একটি সাধারণ লক্ষ্য থাকা। মনে পড়ে যাচ্ছে একজনকে বলতে শুনেছিলাম: "প্রতিক্রিয়াশীলরা ইতিমধ্যেই তাদের যুক্তফ্রন্ট তৈরী করে ফেলেছে কিন্তু আমরা এখনো একত্রিত হতে পারিনি।" বস্তুতঃ ওদের এই ফ্রন্টটা ওরা ইচ্ছাকৃত ভাবে গঠন করেনি। ওদের লক্ষ্য এক এবং কাজও করে চলেছে সেই অনুযায়ী তাই মনে হয় ওদের বোধহয় যুক্তফ্রন্ট আছে। ওদিকে আমরা যে একত্রিত হতে পারছি না তার থেকেই বোঝা যায় যে আমাদের উদ্দেশ্যগুলোই বিভিন্ন--কেউ কাজ করছি একটা গোষ্ঠির জন্যে, কেউ আবার কোন ব্যক্তির জন্যে। আমরা সকলেই যদি শ্রমিক ও কৃষকদের জন্যে কাজ করতে চাইতাম আমাদের সেনাবাহিনীর মধ্যে কিছুতেই বিভেদ থাকতে পারতো না।

স্বপ্নের কথা শুনছি

স্বপ্ন দেখার ব্যাপারে কোন বাধা-নিষেধ নেই, কিন্তু স্বপ্নে কী দেখেছি তা বিবৃত করা বারণ। একথা ঠিক যে স্বপ্ন সবাই ছাখে, কিন্তু কী দেখেছে বলতে গিয়ে কেউ যে মিথ্যে কথা বলবে না এমন কোন নিশ্চয়তা আছে কী! না, তা নেই।

নববর্ষের দিন 'ইস্টার্ন ম্যাগাজিনের' বিশেষ নববর্ষ সংখ্যাখানা হাতে পেয়েছিলাম। পত্রিকাটির শেষাংশে ছিল কয়েকটি "নববর্ষের স্বপ্ন"। "চীনের ও নিজের ভবিষ্যত সম্বন্ধে আপনার স্বপ্ন"—এই বিষয়টির ওপর পত্রিকার দপ্তরে নাকি একশো চল্লিশটিরও বেশী জবাব এসেছিল। সম্পাদকের অসুবিধাটা বেশ বুঝতে পারলাম। বাক্-স্বাধীনতার যখন অভাব তখন স্বপ্নের বিবরণ দেওয়াই ভালো। তথাকথিত সব সত্য উক্তির অন্তর্বর্তী মিথ্যাটুকু নিয়ে আলোচনা না ক'রে স্বপ্নের ভিতরের সত্যটুকু নিয়ে আলোচনা করাই তো ভাল। আগ্রহ ভরে এই অংশটির ওপর চোখ বুলিয়ে কিন্তু দেখতে পেলাম যে সম্পাদক একেবারেই ব্যর্থ হয়েছেন।

এই বিশেষ সংখ্যাটি পাবার আগেই আমার সঙ্গে এমন একজনের দেখা

হয়েছিল যিনি পত্রিকায় লেখা পাঠিয়েছিলেন। এই ভদ্রলোক 'গ্যালি-প্রুফ'টা দেখেছিলেন। তাঁর কাছেই শুনেছিলাম কাগজের বড়কর্তা নাকি তাঁর লেখা জবাবটাকে কেটে-ছেঁটে পাল্টে দিয়েছিলেন। তাঁর আসল স্বপ্নটা ছিল একেবারে অন্য প্রকার। এ তো জানা কথাই যে পুঁজিপতিদের পক্ষে লোকের স্বপ্ন দেখার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা সম্ভব নয়। কিন্তু যেই কেউ কোন স্বপ্নের কথা লিখবে—ক্ষমতায় যদি কুলোয় তো সঙ্গে সঙ্গে ওরা হস্তক্ষেপ করবে। আপনার স্বাধীনতাটুকু হরণ না ক'রে ছাড়বে না। সম্পাদকের বিরাট পরাজয় ঘটেছে এখানেই।

এইসব অন্যায় হস্তক্ষেপের কথা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে এবার বরং দেখা যাক কী কী স্বপ্নের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদক আমাদের এই তথ্যটির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, অংশগ্রহণকারী লেখকদের মধ্যে সকলেই প্রায় বুদ্ধিজীবী এবং এঁরা সবাই প্রথমে নিরাপত্তাহীনতার ভাব প্রকাশ করেছেন, আর তারপর অনেকেই ভবিষ্যতের বুকে এমন একটা উন্নত ধরনের সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন যে সমাজ "সার্বজনীন সাম্য" ও প্রত্যেকের নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কাজের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে। কথাগুলোর মধ্যে কেমন একটা দারুণ "বেআইনি" গোছের স্বাদ আছে। (এই ব্যাখ্যাটি কিন্তু আমার সম্পাদকের নয়।)

এরপরেই কিন্তু সম্পাদক মশাইকে একটু "বোকাটে মার্কা" ব্যবহার শুরু করতে দেখা গেছে। কে জানে কোথেকে একটা তত্ত্বকে পাকড়ে ধ'রে তিনি এই শ'খানেক কি শ'দুয়েক স্বপ্নকে দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করতে আরম্ভ করেছেন। যে যে স্বপ্নে আমাদের চেয়ে উন্নত ধরনের সমাজের প্রসঙ্গ রয়েছে সেগুলোকে তিনি হয় "প্রচারধর্মী" বলেছেন, নয়তো "নাস্তিকতা" বলে আখ্যা দিয়েছেন। প্রাচীন নীতি অনুসারে "স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নদর্শীর চিন্তা-ভাবনা সমূহই ব্যক্ত হওয়া উচিত", আর তাই এই "চিন্তা-ভাবনা সমূহ"-কে একটা অন্তঃসারহীন বিমূর্ত বস্তুতে পরিণত করতে সম্পাদকের এই পীড়াপীড়ি। এখানে কিন্তু মনে রাখা দরকার যে কনফুসিয়াস একবার বলেছিলেন "তোমরা যে যা ভাবছো প্রত্যেকেরই তা বলে ফেলা উচিত।" এই ব'লে কনফুসিয়াস শেষ পর্যন্ত শেঙ টিয়েনের বাসনাটিকে অনুমোদন করেছিলেন, কারণ একমাত্র শেঙ টিয়েনের বাসনাটিই ছিল কনফুসীয় পথের সামিল।

আসলে সম্পাদক যাকে "প্রচারধর্মী" বলেছেন সে ধরনের স্বপ্ন এখানে

খুব অল্পই রয়েছে। এই প্রবন্ধগুলো যেহেতু জাগ্রত অবস্থাতেই লেখা এবং এটা একটা "বুদ্ধির জোর পরীক্ষা" গোছের ব্যাপার, তাই প্রত্যেক লেখককেই এমন একটা করে স্বপ্ন পরিবেশন করতে হয়েছে যা তাঁর বর্তমান চাকুরি, পদমর্যাদা ও পেশার সঙ্গে খাপ খায়। (একথা অবশ্য সেই সব লেখার বেলায় খাটবে না যার অংশবিশেষ বাদ-ছাদ বা পরিবর্তিত করা হয়েছে)। তাই বলছি এই লেখাগুলোকে যতই "প্রচারধর্মী" বলে মনে হোক্ না আসলে কিন্তু ভবিষ্যত কালের সুন্দর সমাজের কথা এখানে আদৌ "প্রচার" করা হয়নি। কয়েকজন লোক "সবার জন্য খাদ্যের" আর, আরো কয়েকজন "শ্রেণীহীন সমাজ" ও "সার্বজনীন সাম্য"র স্বপ্ন দেখেছেন কিন্তু একেবারে মুষ্টিমেয় ক'জন সেই স্বপ্ন দেখেছেন যা এই ধরনের সমাজ গড়তে গেলে সর্বপ্রথমেই প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রাম, শ্বেত সন্ত্রাস, বিমান-হানা অত্যাচারজনিত মৃত্যু, নাকের মধ্যে ফুটন্ত লঙ্কার ঝোল ঢালা, বৈদ্যুতিক শিহরণ প্রয়োগ ইত্যাদি ইত্যাদি। মানুষ যদি এইসব স্বপ্ন না দেখে তাহলে যে যত তেজী লেখাই লিখুক না ওই উন্নত জগতটা কোনদিনই আর বাস্তব রূপ নেবে না। চিরকালই তা স্বপ্ন থেকে যাবে, আর কেবল অন্তঃসারহীন স্বপ্ন দেখাতে শেখাবে।

সে যাই হোক এমন মানুষের অভাব নেই যাঁরা এই স্বপ্নকে সত্যি করে তুলতে চান, যাঁরা কথার বদলে কাজ করেন, ভবিষ্যতকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেন। এই স্বপ্ন যাতে সত্যি হয় তারই জন্যে বর্তমানে তাঁরা সংগ্রামে লিপ্ত। এই কারণেই অনেক বুদ্ধিজীবীকে বাধ্য হয়ে চেষ্টা করতে হয়েছে যাতে সংগ্রামীদের স্বপ্নগুলো "প্রচারধর্মী" বলে মনে হয়। তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে আসলে "প্রচার চালানো হয়েছে" এই সংগ্রামীদেরই বিরুদ্ধে। সংগ্রামীদের নিয়ে বর্তমানে যে প্রচার চালানো হচ্ছে ও ভবিষ্যতেও যা চালানো হবে তাতে যে এঁরা আপত্তি জানাচ্ছেন না সে শুধু রুটি মাখনের খাতিরে।

এখনো পর্যন্ত আমরা প্রাচীন রীতির চিন্তা-ভাবনার জালে এমন জড়িয়ে রয়েছি যে খাদ্যবস্তুর নামোল্লেখ করাটা পর্যন্ত কুৎসিত বলে মনে করি। তা বলে কিন্তু আমার "ইস্টার্ন ম্যাগাজিনের" যোগ্য লেখকদের প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা পোষণ করার ইচ্ছে নেই। সম্পাদক তাঁর মন্তব্যে ফ্রয়েডের দৃষ্টিভঙ্গী উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে "সনাতন" স্বপ্ন সমূহ মানুষের হৃদয়ের গোপন কথা ব্যক্ত করে এবং এর কোন সামাজিক তাৎপর্য নেই।" ব্যাপারটা

হচ্ছে ফ্রয়েডের ধারণা ছিল সব স্বপ্নের মূলে রয়েছে অবদমন—কিন্তু মানুষ অবদমিত হয় কেন? ব্যাপারটা সমাজ-ব্যবস্থা, রীতি-নীতি ও এই জাতীয় যা কিছু আছে সবের সঙ্গেই জড়িত। স্বপ্ন দেখার মধ্যে দোষের কিছু নেই কিন্তু সেটা বিবৃত করা মাত্র সে সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে ও তা বিশ্লেষিত হতে থাকে—সেটা তখন ভারী অনুচিত একটা রূপ ধারণ করে। সম্পাদকের মাথায় এ কথাটা খেলেনি বলেই বোধহয় তিনি এমন অবিবেচকের মতো পুঁজিপতিদের দলে যোগ দিয়ে তাদের বহু রক্ত ঝরানো কলমখানা হাতে তুলে নিয়েছেন। কিন্তু "অবদমন" তত্ত্বের সাহায্যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করাটাকে নতুনত্ব বলে মনে করবে এমন কোনো লোকের আজকাল দেখা মেলাই ভার।

আমার যা মনে হয়, ফ্রয়েডের সম্ভবতঃ একটু-আধটু পয়সাকড়ি ছিল, যা প্রাণ চায় খেতে পেরেছেন। রুটি মাখনের চিন্তা তাই তাঁর কাছে আদৌ কোন সমস্যা বলেই মনে হত না। অগত্যা বিশেষ ঝোঁকটা পড়ল যৌনতার ওপর, আর সশব্দ করতালি দিয়ে উঠল বেশ কিছু অনুরূপ পরিবেশোদ্ভূত লোক। বিশ্বাস করুন ফ্রয়েড সত্যিই এ-কথাও বলেছিলেন যে কন্যারা তাদের পিতাকে ও পুত্ররা তাদের মাতাকে বেশী পছন্দ করে, কারণ তারা হচ্ছে বিপরীত লিঙ্গের জীব। ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, শিশু মাত্রেই জাত হবার অল্পক্ষণের মধ্যেই ঠোঁট চাটতে শুরু করে, এধার-সেধার মাথা নাড়তে থাকে। তার মানে কি সে বিপরীত লিঙ্গের একজন কাউকে চুমু খাবে বলে খুঁজছে? তা নয়, একথা আর কার অজানা যে ও খেতে চাইছে।

সত্যিই তাই—যৌন আকাঙ্ক্ষার চাইতে আহারের আকাঙ্ক্ষা ঢের গভীর। আজ যখন প্রেম আর প্রেমপত্র সংশ্লিষ্ট অন্তহীন গল্পের মধ্যেও কারুরই ঘৃণ্য কিছু চোখে পড়ছে না তখন আহার্যের কথা পাড়াটাই বা আমরা কোন যুক্তিতে নিষিদ্ধ করি? এখন এইসব কথাগুলো যেহেতু জাগ্রত স্বপ্ন তাই মিথ্যা ভাষণ পুরোপুরি এড়ানো খুবই শক্ত। বিশেষতঃ বিষয়টি যখন আবার "একটি স্বপ্ন" এবং সম্পাদক বলেছেন, "আমাদের পার্থিব উপকরণের প্রয়োজনীয়তা আত্মিক প্রয়োজনীয়তার চেয়ে অনেক বেশী।" তাই সেন্সারের (ফ্রয়েডের ভাষাই ব্যবহৃত হল) ঢিলেমির সুযোগ নিয়ে সম্পাদক এমনি ক'টা স্বপ্নের কথা ছেপে দিয়েছেন। আসলে এ সেই "স্বপ্নের মধ্যে পোস্টার সাঁটা আর স্লোগান দেওয়া"র মতো একটা ব্যাপার। এটাকে সোজাসুজি প্রচার বলা চলে। অবশ্য এমনও

হতে পারে যে কয়েকটা স্লোগানকে আপাত ভাবে যা মনে হচ্ছে আসলে তা ঠিক তার উল্টো।

সময় এত দ্রুত পাল্টাচ্ছে আর রুটি ও মাখন খুঁজে পেতে যোগাড় করা এত কষ্টকর হয়ে পড়েছে যে অনেকেই বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা ভাবতে বসে কেবল এই ধরনের স্বপ্ন ছাড়া অন্য কিছুর বিবরণ দিতে পারছে না। আমরা সবাই পেটিবুর্জোয়া (আমাকে যদিও "সামন্ততন্ত্রের শাবক" ও সাহিত্য জগতের বুর্জোয়া বলা হয় তবু নিজেকে আমি পেটিবুর্জোয়া বলে মনে করি), তাই পরস্পরকে আমরা নিশ্চয় বেশ ভাল মতোই চিনি এবং কোনো কিছু গোপন রাখার চেষ্টা করাটাও অপ্রয়োজনীয়।

আর সেই সব যশস্বী ব্যক্তির কথা যদি ওঠে যারা স্বপ্নের মধ্যে নিজেদের এক একজন সন্ন্যাসী, জেলে, কি কাঠুরে রূপে দ্যাখে বা দ্যাখে যে তারা নিজেদের বর্তমান পেশা ছেড়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা পেশা গ্রহণ করছে, তবে তার থেকে এইটাই পরিষ্কার হয়ে যায় যে নিজেদের অন্নপাত্রের ভঙ্গুরতা সম্বন্ধে এরা সশঙ্কচিত্ত এবং এই বিষয়ে তারা আরো নিশ্চিন্ত হতে চাইছে। সরকারের সঙ্গ ত্যাগ করে সবুজ অরণ্যে, কি বৈদেশিক সুযোগ-সুবিধা ছেড়ে পাহাড়ে ও জলাভূমিতে পলায়ন—এইসব অভিলাষ পূর্বে যেগুলি ব্যক্ত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী সুদূরপ্রসারী। সে সম্বন্ধে অবশ্য এখানে আলোচনা করবো না।